সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের

আমাদের মহাভারত • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মহাভারত অমৃতকথা। সেই কাহিনি সহজ ও লাবণ্যময় ভাষায় শুনিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটরা শুধু নয়, বড়দেরও আকর্ষণ করে সেই রচনা। লেখা নয়, কথক যেন আমাদের গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করছেন।

9 789350 402627

মহাভারত অমৃতকথা। যেমন তার বিস্তার, তেমনই বিচিত্র তার চরিত্রসমূহ। মহাকাব্যটি ধারণ করে আছে বটে পৌরাণিক সময়, কিন্তু আজকের দিনেও তাকে মনে হয় আধুনিক। মহাভারতের আলোয় আজও বিচার করা যায় সমকালকে। একালের অগ্রগণ্য কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরিণত বয়সে হাত দিয়েছিলেন কিশোর উপযোগী মহাভারত রচনায়। 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে সহজ ও লাবণ্যময় ভাষায় রচিত অবিস্মরণীয় 'আমাদের মহাভারত'। ছোটরা শুধু নয়, বড়দেরও আকর্ষণ করে সেই রচনা। লেখা নয়, কথক যেন আমাদের গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করছেন।

৩০০.০০ x2 =

ISBN 978-93-5040-262-7

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র, ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
শিক্ষা: কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। আমৃত্যু আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। ২০০৪-এ সরস্বতী সম্মান।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দু'টি ছদ্মনাম— 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর, ২০১২।

প্রচ্ছদ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আমাদের

মহাভারত

আমাদের
মহাভারত
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

মহাভারতের কাহিনি চিরন্তন। সেই কাহিনিই ছোটদের জন্য সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল আনন্দমেলা পত্রিকায়। কিন্তু তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সেই কাহিনি অসমাপ্ত থেকে গেল। তবু মহাভারতের সম্পূর্ণ কাহিনিটি যাতে পাঠকের সামনে থাকে সেই উদ্দেশ্যে আনন্দমেলা পত্রিকায় মহাভারতের বাকি সামান্য অংশের কাহিনি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হয়। এই বইতেও সেইভাবে প্রকাশিত হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমাদের মহাভারত’।

আমি যখন বেশ ছোট, তখন আমার দিদিমার মুখে প্রায়ই একটা কথা শুনতাম, "যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।" আমি এর মানে বুঝতে পারতাম না। কেমন যেন ধাঁধার মতো মনে হত।

দিদিমার কাছে মানে জিজ্ঞেস করলে তিনি মধুর ভাবে হেসে বলতেন, "তুমি আর একটু বড় হও সোনা, তখন তোমাকে আমি একটা বই পড়তে দেব, তখন তুমি নিজেই সব বুঝবে।"

আমার বয়স তখন সাত বছর, তখনই আমি জানি আমাদের এই দেশটার নাম ভারত, ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়া। কিন্তু দু' বার ভারত কেন?

আমার দিদিমা খুব পড়ুয়া ছিলেন, রোজই কোনও না-কোনও গল্পের বই পড়তেন। একখানা বেশ মোটা বই রাখা থাকত তাঁর বিছানার পাশের র‍্যাকে। প্রত্যেকদিন তার থেকে পড়বেনই দু'-এক পাতা।

বইটির নাম মহাভারত, কাশীরাম দাস বিরচিত। আমি তো বাংলা লেখা পড়তে পারি, সুকুমার রায়ের কয়েকটি কবিতা মুখস্থ। একদিন

দিদিমার সেই বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম, কিছু মানে বুঝতে পারলাম না। বড্ড খটমট। অনেক কথার মানেই জানি না। প্রথম লাইনটাই এ রকম: ‘বিঘ্ন বিনাসন গৌরীর নন্দন...’ নাঃ, এই শব্দ আমার অজানা। তাই এই বইটা আর আমি খুলে দেখিনি।

এর তিন-চার বছর পর গল্পের বই পড়ার নেশা আমায় চেপে ধরেছে। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে রোজ বই নিয়ে আসি। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলেও খুঁজি গল্পের বই, এখন অনেক শক্ত-শক্ত বাংলা শব্দেরও মানে বুঝতে পারি।

একদিন বড়মামার বাড়িতে একটা বই পেলাম, সেটার নাম ‘মহাভারত’। কিন্তু সেটা মোটেই বড় বই নয়, মোট ছিয়ানব্বই পাতা। পদ্যে নয়, গদ্যে লেখা। আমার একটা খটকা লাগল, দিদিমার ঘরে মোটা বইটার নাম মহাভারত আর এই পাতলা বইটার নামও মহাভারত? এই বইটায় তো ‘কাশীরাম দাস বিরচিত’ লেখা নেই!

দিদিমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, “আসল মহাভারত তো সংস্কৃত ভাষায় লেখা, তা আর এখন ক’ জন পড়বে, ক’ জন বুঝবে? তাই বাংলায় প্রথম মহাভারত লিখলেন কাশীরাম দাস। তারপর আরও অনেকে লিখেছেন।”

আমি মনে-মনে ভাবলাম, ‘কাশীরাম দাসবাবু আর একটু সহজ করে লিখলেন না কেন?’

তারপর কেটে গিয়েছে অনেক বছর।

এর মধ্যে আমি জেনে গিয়েছি দিদিমার সেই ধাঁধাটার উত্তর, "যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।" একটা ভারত আমাদের দেশের নাম, আর অন্য ভারত হচ্ছে 'মহাভারত'। তার মানে, আমাদের দেশে যা-যা আছে, তা সবই পাওয়া যাবে মহাভারতের কাহিনিতে। অনেক রকম মহাভারত পড়ার পর আমি বুঝতে পারি, এ কথাটা সত্যিই। আমাদের এত বড় দেশে যা কিছু আছে, তা সবই যেন রয়েছে মহাভারতে। মূল মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আমি যে কতবার পড়েছি, তার ঠিক নেই। এখনও মাঝে-মাঝে সেই বইয়ের যে-কোনও পৃষ্ঠা খুলে পড়তে শুরু করি, প্রত্যেকবারই নতুন মনে হয়।

গত শনিবার আমার বড়মাসির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। চন্দননগরে এদের বাড়িটি খুব সুন্দর, সামনেও একটা বাগান আর পিছনেও বাগান। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যায়। কতরকম পাখি আসে। আমি মাঝে-মাঝে কলকাতা ছেড়ে এখানে আট-দশ দিন থেকে যাই।

বড়মাসির দু'টি ছেলেমেয়ে, টুবলু আর রিয়া। ওরা যমজ, একই দিনে জন্মেছে। কিন্তু একরকম দেখতে নয়। তবে একজনের জ্বর হলে, আর একজনেরও হবেই। দু'জনেই মিষ্টি খাবার পছন্দ করে না, টক খেতে

খুব ভালবাসে। এদের এগারো বছর বয়স, দু'জনেই ইংরেজি স্কুলে পড়ে।

এবারে এসে আমি বসার ঘরে নতুন বই খুঁজছি। টুবলু এসে বলল, "ছোড়দা, তুমি বকরাক্ষস দেখেছ? কত বড় হয়?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুই হঠাৎ বকরাক্ষসের কথা বললি কেন?"

টুবলু বলল, "আমাদের মালি, এই যে ভজন, সে একদিন বাগানের গাছে দু'টো বক দেখে বলল, 'বাড়ির মধ্যে বক আসা মোটেই ভাল নয়। এ দু'টো বকরাক্ষসের বাচ্চা।'"

আমি বললাম, "ধ্যাৎ, বকরাক্ষস মোটেই বকের মতো দেখতে নয়। তুই বকরাক্ষসের গল্পটা জানিস না?"

টুবলু বলল, "হ্যাঁ জানি। ভজনদাদা বলেছে, বকরাক্ষসটা খুব পাজি ছিল, রাম সেটাকে মেরে ফেলেছে।"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "সে কী রে! বকরাক্ষসের গল্প আছে তো মহাভারতে। সেখানে রাম আসবে কী করে? তুই মহাভারত পড়িসনি?"

মাথা দুলিয়ে টুবলু বলল, "না।"

টুবলুর বয়স এগারো বছর, অথচ সে মহাভারতের কথা জানে না! ওর বয়সে আমি দু'-তিন বার পড়ে ফেলেছি। ইংরেজি স্কুলে পড়লে বুঝি জানতে হয় না মহাভারতের কথা?

টুবলু বলল, "রাম মারেনি, তবে কে মেরেছে রাক্ষসটাকে? খুব লড়াই হয়েছিল? গল্পটা বলো না তুমি!"

আমি বললাম, "শুধু বকরাক্ষসের কথা বললেই সব বোঝা যাবে না। আগের কথাও জানতে হবে। তুই পঞ্চপাণ্ডবের নাম জানিস?"

আবার মাথা দুলিয়ে টুবলু বলল, "নাঃ! পঞ্চপাণ্ডব মানে কী?"

আমি মনে-মনে বললাম, 'এই রে, এ তো কিছুই জানে না।'

মুখে বললাম, "পঞ্চ মানে পাঁচ, তা জানিস তো? ওরা পাঁচ ভাই, ওদের বলা হত পাণ্ডব। ওদের কথা আগে জানতে হবে। তা হলে একটা কাজ করা যাক, পুরো মহাভারতের গল্পটাই তোকে ছোট করে শোনাতে পারি। তুই শুনবি?"

টুবলু একটু চিন্তা করে বলল, "যদি ভাল লাগে, তা হলে সবটা শুনব, আর যদি শুনতে ইচ্ছে না করে..."

দরজার কাছে কখন রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ করিনি। সে বলল, "গল্প বলা হবে, আমি শুনব না?"

টুবলু বলল, "ছোড়দা, একটু দাঁড়াও, আমি আমার এক বন্ধুকে ডেকে আনি।"

টুবলু দৌড়ে গিয়ে একজনের বদলে দু'জন ছেলেকে ডেকে আনল।

তারপর শুরু হল গল্প।

এসো, তোমাদের সঙ্গে আমিও আবার নতুন করে মহাভারত পড়ি।

মহাভারত একখানা অসাধারণ বই। যারা এই বই একবার মন দিয়ে পড়েছে, তারা সারা জীবনেও ভুলতে পারে না।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত বই চারখানা। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড আর ওডিসি। এ ছাড়াও আছে বাইবেল, কোরান, গীতা এইসব, কিন্তু সেগুলো ধর্মের বই। প্রথম চারখানা শুধু গল্পের বই। তার মধ্যেও মহাভারতই সবচেয়ে বড়। দারুণ-দারুণ সব গল্প আছে এই বইতে।

এই চারখানা বইকেই বলে মহাকাব্য। আমি তবে গল্পের বই বলছি কেন? এই সব গল্পই কবিতার ছন্দে লেখা। তার কারণ, তখনকার দিনে গদ্য লেখার চল ছিল না। আর কবিতায় গল্প লেখার প্রধান কারণ, তখন তো আর বইয়ের দোকান ছিল না। বই ছাপাই হত না। একজন কেউ লিখতেন, অন্যরা তা শুনে-শুনে মুখস্থ করতেন। আর গদ্যের চেয়ে কবিতা মুখস্থ রাখাই অনেক সহজ। সে সময়কার মানুষ খাঁটি ঘি-দুধ আর টাটকা ফলমূল খেতেন। তাই তাঁদের স্মৃতিশক্তিও খুব বেশি ছিল। সেজন্যই তাঁরা অত লম্বা-লম্বা কবিতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারতেন।

আচ্ছা, মহাভারতের কাহিনিটা আমরা কার কাছ থেকে পেয়েছি?

তোমাদের মধ্যে যারা বেশ পড়ুয়া, তারা টক করে বলে দেবে, "কেন, এটা তো বেদব্যাস ঋষির লেখা, তা সবাই জানে!"

বেদব্যাস ঋষি মহাভারত রচনা করেছেন, তা ঠিকই। কিন্তু বেদব্যাস যে কত হাজার বছর আগে লিখেছিলেন, তারই তো ঠিক নেই। তিনি নিজেই কি এত বড় গল্পটা বানিয়েছেন? নাকি তিনি লিখেছিলেন ছোট করে, তারপর অন্য কোনও-কোনও ঋষি নিজেরাও কিছু-কিছু গল্প ঢুকিয়ে দিয়েছেন, রং চড়িয়েছেন? সেটাই বোধ হয় সম্ভব। আর বেদব্যাস নিজের হাতেও এটা লেখেননি। খুব সম্ভবত তিনি লিখতে জানতেনই না! আগেকার দিনের অনেক মুনি-ঋষিই লিখতে-পড়তে জানতেন না। তাঁরা মনে-মনে অনেক অসাধারণ শ্লোক রচনা করতে পারতেন। কী দারুণ প্রতিভা ছিল তাঁদের! বেদব্যাসও মনে-মনে এই বিশাল কাহিনিটি তৈরি করলেন, তারপর কোথাও তো লিখে রাখাও দরকার। তখন তিনি দেবতাদের মধ্যে থেকে গণেশকে অনুরোধ করলেন তাঁর এই উপন্যাসটা লিখে দেওয়ার জন্য। গণেশ ছিলেন পড়াশোনায় ফার্স্ট বয়। মানুষের মতো শরীর আর শুঁড়ওয়ালা হাতির মতো মাথা হলে কী হয়, সাংঘাতিক তাঁর মেধা। গণেশ রাজি হলেন লিখতে।

লেখার পর ব্যাসদেব প্রথমে তাঁর ছেলে শুকদেবকে সবটা শিখিয়ে দিলেন। তারপর শেখালেন আর কয়েকজন শিষ্যকে। এঁরা আবার

শোনাতে লাগলেন অন্যদের। এইভাবে লোকের মুখে-মুখে ছড়াতে লাগল মহাভারতের গল্প। এই গল্পের এমনই টান, যে একটু শুনেছে, সে-ই তৃষ্ণার্তের মতো বসে থাকে বাকি সবটা শোনার জন্য।

আমরা পেলাম কার কাছ থেকে?

মহাভারত লেখার অনেক বছর পরের কথা। শৌনক নামে একজন খুব বড় ঋষি জঙ্গলের মধ্যে আশ্রমে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। বারো বছর ধরে চলবে সেই যজ্ঞ। আরও অনেক মুনি-ঋষি এসে থাকছেন সেখানে। দিনের বেলা আগুন জ্বেলে যজ্ঞ আর মন্ত্র উচ্চারণ হয়, আর সন্ধেবেলা সকলে মিলে এক জায়গায় বসে গল্প করেন।

একদিন সেখানে সৌতি নামে একজন এসে উপস্থিত হলেন। এঁর কাঁধে নানারকম পোঁটলাপুঁটলি দেখলেই বোঝা যায়, ইনি নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। ইনি কিন্তু ব্রাহ্মণ নন, সূত। সূতরা রথ চালান কিংবা অন্য ব্যাবসা-ট্যাবসা করেন, কেউ-কেউ গল্প বলতেও খুব ওস্তাদ। এখন যেমন অনেকে ঘুরে-ঘুরে বই বিক্রি করে, তখন তো বই ছিল না। তাই এই ধরনের লোকেরা ঘুরে-ঘুরে নানান জায়গায় গল্প শোনাতেন। তার মানে, গল্প শোনানোটাও কারও-কারও জীবিকা হতে পারে। ব্রাহ্মণ নন বলেই সৌতি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেননি, এসেছেন গল্প শোনাবার জন্য। গল্প শুনিয়ে বেশ

কিছুটা আতপ চাল, নানান রকম ফল আর দু'-এক টুকরো সোনাও পাওয়া যায়। সৌতি এঁর আসল নাম নয়। অন্য একটা নামও আছে। তার দরকার নেই।

সৌতিকে দেখে ঋষিরা তাঁকে গল্পকথক বলে চিনলেন। অমনি কয়েকজন তাঁকে খাতির করে বললেন, "আরে ভাই, এসো-এসো, বোসো। অনেক দূর থেকে আসছ মনে হচ্ছে। বিশ্রাম করো, জল খাও।"

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন কোথা থেকে এলে?"

সৌতি বললেন, "আমি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম, সেখানে মহাঋষি বেদব্যাসের পুরো মহাভারত শুনলাম।"

কয়েকজন চমকে উঠে বললেন, "সর্পযজ্ঞ! সে আবার কী?"

সৌতি বললেন, "বলছি, বলছি। সেই যজ্ঞ থেকে ফিরে আমি অনেক তীর্থস্থানে গেলাম, অনেক আশ্রমে ঘুরলাম। তারপর সমন্ত পঞ্চক নামে এক তীর্থস্থানে গেলাম। সেখানে কৌরব আর পাণ্ডবদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর আবার ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়লাম এখানে। এখন বলুন, আপনারা কোন গল্প শুনতে চান? আমার ঝুলিতে অনেক রাজারাজড়ার গল্পই আছে।"

তখন ওখানকার সব ঋষি বললেন, "তুমি আজকের ওই মহাভারতের গল্পই শোনাও। মহাত্মা বেদব্যাসের মহাভারতের নাম

শুনেছি, কখনও শোনার সৌভাগ্য হয়নি। সেটাই শুনতে চাই।”

একজন জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি স্বয়ং বেদব্যাস ঋষির মুখ থেকে সেই কাহিনি শুনলে?”

সৌতি বললেন, “আজ্ঞে না। মহাত্মা বেদব্যাসের এক শিষ্য, তাঁর নাম বৈশম্পায়ন, তিনিই শুনিয়েছেন। মহারাজ জনমেজয় জানতে চাইছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাহিনি। তবে স্বয়ং বেদব্যাসও সেখানে বসে ছিলেন তাঁর শিষ্যের পাশে।”

ওইখানে বসে শুনে-শুনেই সৌতি সব মুখস্থ করে ফেলেছিলেন? কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

এই সৌতির মুখ থেকেই আমরাও শুনলাম মহাভারতকাহিনি। বহু বছর পর এই সৌতির মুখের কাহিনি নিয়েই বই ছাপা হয়েছে।

সেই কাহিনি শুরু করার আগে, একটা প্রশ্ন জাগে, রাজা জনমেজয়ের সভায় বেদব্যাস ঋষি বসে থাকলেন কী করে? তাঁর বয়স কত?

সত্যি কথা বলতে কী, বেদব্যাসের বয়সের গাছপাথর নেই। মহাভারতের আসল নায়ক-নায়িকাদের বহু আগে তাঁর জন্ম, তার পরেও বহু বছর, এমনকী, এ-কথাও বলা যেতে পারে যে, তিনি আজও বেঁচে আছেন! পুরাণকাহিনি অনুসারে তিনি অমর, বেশ লম্বা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, পেট পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, মাথার চুলে জটা, তিনি আজও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য এ যুগে তিনি চেহারা

পালটে ফেলে ফুলবাবু সাজতেও পারেন। এ রকমও কল্পনা করা যায়, এখন মহাভারত নিয়ে যত সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, নাচ-গান হয়, বেদব্যাস ঋষি আড়ালে বসে সব দেখছেন আর মৃদু-মৃদু হাসছেন। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি মুনি কিন্তু অমর নন, তিনি মরে গিয়েছেন কবেই। তিনি এখন চতুর্দিকে রামায়ণ নিয়ে যে কত টিভি সিরিয়াল আর নাটক হয়, তার কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।

পুরাণে মোট সাত জনকে বলা হয়েছে অমর। অশ্বত্থামা, দৈত্যরাজ বলি, ঋষি বেদব্যাস, রামায়ণের হনুমান আর বিভীষণ, কৃপ আর পরশুরাম। এঁদের মধ্যে পরশুরামের কথা রামায়ণ আর মহাভারত দু'টোতেই আছে। এঁরা কেন বা কী করে অমর হলেন, তা আস্তে-আস্তে জানা যাবে।

সৌতির গল্প বলার কায়দাটা খুব অদ্ভুত। সোজাসুজি কিছু বলেন না। প্রথমে তিনি পুরো কাহিনিটাই খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন। তাতে না আছে কোনও রস, না আছে মজা। তা শুনেই ঋষিরা হইহই করে উঠলেন, তাঁরা বললেন, "এ কী, মোটে এইটুকু! না, না, আমাদের হাতে অনেক সময় আছে, তুমি ধীরেসুস্থে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব বলো।"

সৌতি তখনও কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করলেন না। এই ঋষির

গল্প, কোথায় কার সঙ্গে কার ঝগড়া, এইসব শোনাতে লাগলেন ছাড়া-ছাড়া ভাবে। এতেও কারও মন ভরে না। সকলে তোয়াজ করতে লাগলেন সৌতিকে। সর্পযজ্ঞের ব্যাপারটাই বা কী? সেটাও সৌতি ঠিক খুলে বলেন না, একটু ছুঁয়েই চলে যান অন্য দিকে, যাতে সকলের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।

আসলে জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞ হয়েছিল মহাভারত কাহিনির একেবারে শেষে। অনেক গল্প বা সিনেমা যেমন ফ্ল্যাশব্যাকে হয়, শেষ থেকে শুরু, সর্পযজ্ঞ ব্যাপারটাও তাই। আমরা অত ঘোরালো-পাঁচালো ভাবে মহাভারত পড়তে চাই না। আমরা শুরু করব প্রথম থেকে।

॥ ২ ॥

এক যে ছিলেন রাজা...

কোন রাজা?

মহাভারতে এত রাজা আর তাঁদের বংশধরদের কথা আছে যে, মাথা গুলিয়ে যায়। অত মনে রাখাও যায় না। সব মনে রাখার দরকারও নেই।

আমরা একজন রাজাকে বেছে নিচ্ছি, তাঁর নাম যযাতি। এই যযাতিকে বেছে নেওয়ার একটা কারণও আছে।

এই যযাতির কথা বলার আগে একটু আগের কথা বলতে হবে। সেই সময় আকাশে থাকতেন দেবতারা আর অসুররা ছড়িয়ে ছিলেন পৃথিবীর নানান জায়গায়, তাঁরা সমুদ্রের তলাতেও থাকতে পারতেন। দেবতা আর অসুরদের প্রায়ই লড়াই হত। দু' পক্ষের ক্ষমতাই প্রায় সমান-সমান। যুদ্ধে অনেক অসুর যেমন মরত, তেমনি প্রাণ হারাতেন অনেক দেবতা।
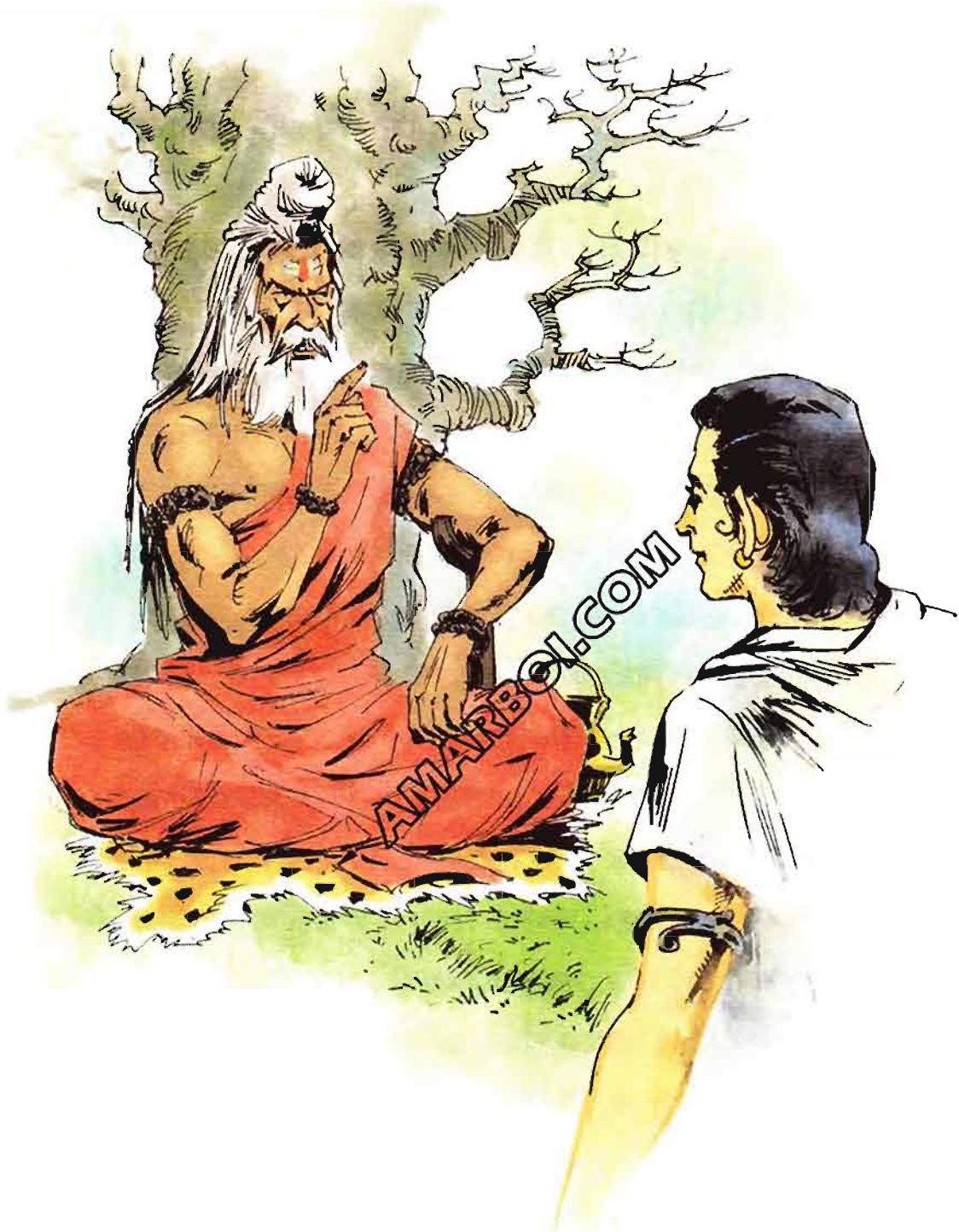
দেবতারাও প্রাণ হারাতেন? সে কী! আমরা যে জানি, দেবতারা সকলেই অমর?

হ্যাঁ, এখন সব দেবতাই অমর ঠিকই, কিন্তু সে আমলে অমর ছিলেন না। তখনও তো তাঁরা অমৃত খাননি। পরে একসময় কোথা থেকে কলসিভরতি অমৃত পাওয়া গেল আর অসুরদের ঠকিয়ে দেবতারা সব অমৃত কীভাবে খেয়ে নিলেন, সে গল্প আমরা যথাসময়ে শুনব।

এখন যে আমলের কথা বলছি, তখন দেবতাদের তুলনায় বরং অসুরদের খানিকটা সুবিধেই ছিল। যুদ্ধে প্রাণ হারালেও কিছু-কিছু অসুর আবার বেঁচে উঠত। অমৃত না খেয়েই। কী করে?

দেবতাদের গুরুর নাম বৃহস্পতি আর অসুরদের গুরুর নাম শুক্রাচার্য, দু'জনেই খুব তেজস্বী। তবে বৃহস্পতির তুলনায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের একটা গুণ বেশি ছিল, তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন, অর্থাৎ মৃতদের মন্ত্র পড়ে বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। তাই নিয়ে দেবতাদের বেশ দুঃখ ছিল।

তখন দেবতারা এক বুদ্ধি বের করলেন।

গুরু বৃহস্পতির একটি ছেলে আছে, যেমন সে চেহারায় রূপবান, তেমনই তার ব্যবহার সুন্দর। তার সঙ্গে কথা বললে সকলে খুশি হয়। এই ছেলেটির নাম কচ।

কয়েকজন দেবতা বৃহস্পতিকে অনুরোধ করলেন, "আপনার

ছেলেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন না। শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্য হতে চাইবে। সেখানে শাস্ত্রপাঠ-টাঠ করতে-করতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রটাও শিখে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। তারপর যত যুদ্ধ হবে, আমরাও মৃতদের বাঁচিয়ে দিতে পারব।”

বৃহস্পতি হেসে বললেন, “অত কি সোজা?”

দেবতারা বললেন, “কেন? বড়-বড় পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে কেউ যদি শিষ্য হতে চায়, তাঁরা তো ফিরিয়ে দেন না। শুক্রাচার্য ওকে ফিরিয়ে দেবেন?”

বৃহস্পতি বললেন, “তা ফিরিয়ে দেবেন না। শুক্রাচার্য অতি ধুরন্ধর লোক। কচকে দেখলে উনি বুঝবেন, কেন সে এসেছে। আমার ছেলে হয়ে সে যাবে আমার শত্রুপক্ষের কাছে শাস্ত্র শিখতে? শুক্রাচার্য ওকে আর সবই শেখাবেন, আসল জিনিসটা ছাড়া।”

একজন দেবতা বললেন, “শুক্রাচার্যের একটি মেয়ে আছে, তার নাম দেবযানী। এই কচেরই বয়সি হবে। কচ যদি তার সঙ্গে ভাব করে নিতে পারে, তা হলে সে হয়তো বাবাকে বলে কচকে সাহায্য করতে পারে।”

বৃহস্পতি বললেন, “ঠিক আছে, গিয়ে দেখুক! যদি কার্যসিদ্ধি করতে পারে। তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে। অসুররাও ওর আসল উদ্দেশ্যটা টের পেয়ে গেলে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।”

তারপর শুভদিন দেখে কচ এসে পৌঁছে গেল পৃথিবীতে। অসুররাজার সভায় এসে গুরু শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানাল।

মিথ্যে কথা বলার তো উপায় নেই। শুক্রাচার্যের মতো বড়-বড় ঋষিরা যোগবলে এক নিমেষে সব জেনে যেতে পারেন। তিনি বললেন, "ঠিক আছে বৎস, আমি তোমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলাম। তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমি তোমাকে শাস্ত্র শেখাব।"

শুক্রাচার্য কচকে খুব কঠিন-কঠিন শাস্ত্রপাঠ দিতে লাগলেন। তিনি দেখতে চান, এত শক্ত-শক্ত পড়া দেখে ছেলেটি পালিয়ে যায় কিনা। কচ কিন্তু দারুণ ধৈর্যের সঙ্গে সব শিখতে লাগল।

দেবযানীর সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল সহজেই। দেবযানীর বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আশপাশের কোনও মুনি-ঋষির ছেলেকেই তার পছন্দ হয়নি। তার বাবাও জোর করেন না। কোনও দিন ইচ্ছে হলে সে নিজেই বিয়ে করবে। কচ নাচ জানে, গান জানে, দেবযানী তো এসব আগে কখনও শেখেনি। দু'জনে ওরা বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে গান গায়।

একদিন দেবযানী কচকে দেখতে পেল না, সে কোথায় গেল? তার কুটিরে নেই, জলাশয়ের ধারে নেই, শুক্রাচার্যের আশ্রমে নেই। তা হলে? পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গেল দেবলোকে?

দেবযানী গিয়ে তার বাবার কাছে কেঁদে পড়ল।

শুক্রাচার্য তখন যজ্ঞের আগুন জ্বেলে সঞ্জীবনী মন্ত্র পাঠ করলেন। তারপর উঁচু গলায় ডাকলেন, "কচ, কচ, তুমি যেখানেই থাকো, এই মুহূর্তে আমার সামনে এসে উপস্থিত হও!"

তখনই কাদের একটা কুকুর বিকট চিৎকার করে উঠল। তার পেট ফেটে সেখান থেকে বেরিয়ে এল কচ। ঠিক আগের মতো চেহারা।

এ কী ব্যাপার হল? সে কুকুরের পেটে গিয়েছিল কী করে?

কচ বলল, "আমি ঠিক জানি না, আমি কী দোষ করেছি। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন অসুর আমাকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে লাগল। তারপর একেবারে কুচি-কুচি করে কেটে খাইয়ে দিল একটা কুকুরকে। কেন তারা এমন করল, আমি জানি না।"

শুক্রাচার্য বললেন, "কিছু-কিছু অসুর সন্দেহ করেছে, কেন শত্রুপক্ষ বৃহস্পতির পুত্রকে পাঠিয়েছে এখানে।"

তিনি শুধু বললেন, "হুঁ, সাবধানে থেকো।"

কচ এই প্রথম মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল। অসুররা তার সারা শরীরটা একেবারে খণ্ড-খণ্ড করে কেটেছিল, কিন্তু এখন সারা শরীরে একটুও দাগ নেই। সব ঠিকঠাক আগের মতো। কবে সে এই মন্ত্র শিখবে?

শুক্রাচার্য কিন্তু তাকে এই মন্ত্র শেখাবার কোনও নামই করছেন না। আরও কঠিন-কঠিন শাস্ত্র পড়াচ্ছেন।

কয়েকজন অসুর আবার একদিন কচকে ধরে নিয়ে গেল নদীর ধারে। তাকে খুন করে ভাসিয়ে দিল জলে।

এবারেও দেবযানীর কান্নাকাটিতে শুক্রাচার্য বাঁচিয়ে দিলেন কচকে।

কথায় বলে, বারবার তিন বার। অসুররা এবার এমন সাংঘাতিক একটা কাণ্ড করল, যাতে কচকে বাঁচাবার আর কোনও উপায়ই রইল না।

রাত্তিরবেলা যখন সকলে ঘুমন্ত, তখন কয়েকজন অসুর নিঃশব্দে কচকে তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুন করল। তারপর পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল একেবারে। সেই ছাই সবটুকু তুলে মিশিয়ে দিল এক হাঁড়ি সোমরসের মধ্যে। খানিকটা লেবুর রস দিয়ে সেই রসকে আরও সুস্বাদু করা হল। সেই হাঁড়িটা রেখে দেওয়া হল শুক্রাচার্যের আশ্রমে।

পরদিন সন্ধেবেলা শুক্রাচার্য একটু-একটু সোমরস পান করতে-করতে সবটাই শেষ করে ফেললেন। আজ একটু অন্যরকম স্বাদ হলেও ভালই লাগল তাঁর।

এদিকে আবার পাওয়া যাচ্ছে না কচকে। তাকে একা-একা বেশি

দূর যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। সে যেতও না, তবু সে হারিয়ে গেল কী করে? দেবযানী জঙ্গলে, নদীর ধারে সব জায়গায় তন্নতন্ন খুঁজেও কচকে পেল না। পাবে কী করে? কচ তো আর নেই।

দেবযানী এমন কাঁদতে লাগল, যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে।

শুক্রাচার্য আবার যজ্ঞের আগুন জ্বালালেন। তারপর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র সবেমাত্র একটুখানি উচ্চারণ করতে না-করতেই তাঁর পেটের মধ্যে থেকে কচ বলে উঠল, "গুরুদেব, এই যে আমি এখানে।"

কাছাকাছি যারা রয়েছে, সবাই একেবারে স্তম্ভিত। মানুষের পেটের মধ্যে মানুষ? তাও বেঁচে আছে!

এখন কী হবে?

কচকে বাঁচাতে হলে শুক্রাচার্যকে মরতে হবে। কারণ, তার পেট ভেদ করে বের করতে হবে কচকে। আর শুক্রাচার্যকে বাঁচাতে হলে কচকে একেবারে হজম করে ফেলতে হবে। একেই বলে, উভয় সংকট!

সন্ধেবেলা আর সবাই চলে গিয়েছে। শুক্রাচার্যের কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেবযানী। তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে শুক্রাচার্য ভাঙা-ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কী চাস বল তো, মা? আমি মরে গিয়ে কচকে বাঁচিয়ে তুলব? তোর জন্য আমি তাতেও রাজি আছি।"

দেবযানী মুখ তুলে “না-না!” বলে চিৎকার করে উঠল।

সে তার বাবাকে খুবই ভালবাসে। বাবার মৃত্যু চাইতে পারে না। আবার কচের মৃত্যুও সে সহ্য করতে পারছে না।

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, “বাবা, এমন কি কোনও উপায় নেই, যাতে তোমরা দু’জনেই বেঁচে থাকতে পার?”

তখনই উত্তর না দিয়ে শুক্রাচার্য চুপ করে রইলেন।

একটি মাত্র উপায় আছে, যদি অন্য কাউকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রটি প্রয়োগ করতে শিখিয়ে দেওয়া যায়। সে তা হলে প্রথমে শুক্রাচার্যের পেট ফাটিয়ে কচকে বের করে আনবে, তারপর সেই মন্ত্রেই সে আবার শুক্রাচার্যকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এ মন্ত্র তো যে-কেউ শিখতে পারে না। তার জন্য অনেক শাস্ত্রপাঠ, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। অসুরদের মধ্যে কারও তা নেই। একমাত্র কচেরই সে যোগ্যতা আছে। গুরুর পেটের মধ্যে কচ এখনও বেঁচে আছে, তাকে এই মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া এখনও সম্ভব।

শুক্রাচার্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি এতদিন ধরে কিছুতেই কচকে সেই মন্ত্র দান করেননি, এখন নির্বোধ অসুরদের এই কাণ্ডের জন্য তিনি কচকে শেখাতে বাধ্য হলেন।

কচ বেঁচে ওঠার পর যদি শুক্রাচার্যকে বাঁচাতে রাজি না হয়? সে তো আসলে শত্রুপক্ষের লোক। মন্ত্রটা পাওয়ার পর ছিন্নভিন্ন অবস্থায়

শুক্রাচার্যকে ফেলে রেখে সে পালিয়ে যেতে পারে দেবলোকে। সেখানে আনন্দের উৎসব শুরু হয়ে যাবে। কচ মৃত সব দেবতাদের বাঁচিয়ে তুলবে আর অসুরদের কেউ থাকবে না।

তবু শুক্রাচার্য নিজের পেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস কচ, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?"

কচ বলল, "কষ্ট যাই হোক, আপনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।"

শুক্রাচার্য বললেন, "তা হলে মন দিয়ে শোনো, আমি তোমাকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনব। আমি এখানে যে যজ্ঞের আগুন জ্বেলেছি, সেই আগুনেই তুমি এই মন্ত্র পড়ে আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পার। যদি তোমার ইচ্ছে হয়।"

মন্ত্র পড়লেন শুক্রাচার্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শরীর নিয়ে শুক্রাচার্যের পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে এল কচ। শুক্রাচার্য কোনও রকম যন্ত্রণার শব্দও করলেন না। রক্তাক্ত শরীরে চিত হয়ে পড়ে রইলেন।

বাবার ওই অবস্থা দেখে আকুল ভাবে কাঁদতে লাগল দেবযানী। কচ তার দিকে একবারও তাকাল না, সে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল।

প্রথমবার একটু ভুল হলেও যজ্ঞে পরপর তিন বার সেই মন্ত্র সম্পূর্ণ

করার পর প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন শুক্রাচার্য, তাঁর শরীর ঠিক আগের মতো।

কচ এবার শুক্রাচার্যের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে আনন্দ আর কান্না মেশানো গলায় বলতে লাগল, "গুরুদেব, আপনি বারবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনি আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র দান করেছেন। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনি যা আদেশ দেবেন, তাই পালন করব।"

শুক্রাচার্য তার মাথায় হাত ছুঁইয়ে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করলেন।

কচ বলল, "গুরুদেব, আপনি অনুমতি দিলে আমি এবার বাড়ি ফিরে যেতে পারি। অনেক দিন আপনজনদের দেখিনি। মন কেমন করছে।"

শুক্রাচার্য বললেন, "এবার তো তুমি ফিরে যেতেই পার। তোমাকে আমি আটকাব কী করে? অনেক দিন এখানে আছ ঠিকই। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসেছিলে, তাও সিদ্ধ হয়েছে। যাও, ফিরে যাও! এখানে অসুররা তোমাকে আবার মেরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।"

কিন্তু তখনই ফিরে যাওয়া কচের পক্ষে সহজ হল না।

বাবা বেঁচে আছেন। প্রিয় বন্ধু কচও ফিরে এসেছে, তাই দেবযানীর আনন্দের সীমা নেই। সে বাইরের বাগানে বসে কচের কাছে গান শুনতে চাইল।

দু'-তিন খানা গান শোনাবার পর কচ বলল, "হে দেবী, এবার আমায় যেতে হবে।"

দেবযানী হেসে বলল, "আমি হঠাৎ দেবী হয়ে গেলাম কেন? আমি তো তোমার বন্ধু।"

কচ গম্ভীর ভাবে বলল, "তুমি আমার গুরুর মেয়ে। তোমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলাই তো আমার উচিত।"

এর পর কচ নিজের দেশে ফিরে যাবে শুনে দেবযানী আঁতকে উঠল।

সে বলল, "না, না। তোমার ফেরা হবে না। আমি তো ঠিক করে ফেলেছি, আমাদের দু'জনের বিয়ে হবে। তুমি এখানেই থাকবে।"

কচের পক্ষে তো আর এখানে থেকে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল, দেবতারাও অপেক্ষা করছেন তার জন্য।

দেবযানী আবার বলল, "আমি তোমার কত সেবা করেছি। আমার জন্যই বাবা বারবার তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। আমার জন্যই তুমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছ। এখন আমায় ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?"

কচ বলল, "তুমি আমার অশেষ উপকার করেছ, তা ঠিক। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। আমি

গুরু শুক্রাচার্যের শরীরের মধ্যে ছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়েছি, সুতরাং আমি তাঁর ছেলের মতো হয়ে গিয়েছি। আর তুমি তাঁর মেয়ে। তার মানে, আমরা তো ভাই-বোন। ভাই-বোনে আবার বিয়ে হয় নাকি?"

দেবযানী বলল, "ধ্যাৎ, যতসব বাজে কথা।"

এই রকম তর্ক হতে-হতে দেবযানী একসময় খুব রেগে গিয়ে বলল, "আমি তোমার এত উপকার করলাম, আর তার বদলে তুমি আমায় অপমান করছ? বেশ, যাও ফিরে যাও! আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখলে, সেটা তুমি প্রয়োগ করতে পারবে না। তুমি কাউকেই বাঁচাতে পারবে না।"

এই অভিশাপ শুনে কচ বেশ কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। যাঃ, তার এত কষ্ট, এত সাধনা বৃথা গেল? এত বড় ঋষির মেয়ের কথা তো মিথ্যে হবে না।

একটু পরে সে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলল, "দেবযানী, তুমি অন্যায় ভাবে আমাকে এই অভিশাপ দিলে। তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, কোনও ঋষিপুত্রের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে না। আর সঞ্জীবনী মন্ত্র আমি প্রয়োগ করতে পারব না বটে, কিন্তু অন্যদের তো শেখাতে পারব? সেরকম শিষ্য তৈরি করে নেব আমি।"

এই বলে কচ চলে গেল দেবলোকে।

দেবযানীর মনে আর সুখ নেই। তার আর নাচতে ভাল লাগে না, গান গাইতে ভাল লাগে না। একা-একা ঘুরে বেড়ায়। মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছে, যার-তার সঙ্গে ঝগড়া করে।

একদিন সাংঘাতিক ঝগড়া হয়ে গেল সেখানকার রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে।

অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী প্রায় সমান বয়সি। দু'জনেই রূপে-গুণে সমান। তবে রাজার মেয়ে বলে শর্মিষ্ঠার ব্যবহারে সব সময় অহংকার-অহংকার ভাব।

একদিন দু'জনেই অনেক সঙ্গী ও সহচরী নিয়ে খেলা করছিল বাগানে। তারপর একটা সরোবরে নেমে গেল সাঁতার কাটতে। এই সময় প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। তার ফলে, উপরে রেখে যাওয়া মেয়েদের পোশাক-আশাকগুলো জড়িয়েমড়িয়ে গেল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি উঠে এসে দৌড়ে খুঁজতে লাগল নিজেদের পোশাক।

শর্মিষ্ঠা ভুল করে দেবযানীর একটা ওড়না জড়িয়ে নিল নিজের গায়ে।

দেবযানীর এমনিতেই মেজাজ খারাপ। সে রেগেমেগে বলল, “এই, তুই আমার ওড়না নিয়েছিস কেন রে?”

শর্মিষ্ঠা বলল, “ও, ভুল হয়ে গিয়েছে, দেখছি।”

দেবযানী বলল, “তোরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে জানিস

না। আমার ওড়নাতে বিচ্ছিরি গন্ধ হয়ে যাবে।”

এবার শর্মিষ্ঠাও রেগে উঠে বলল, “আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে জানি না? তুই কি জানিস? থাকিস তো একটা কুঁড়েঘরে। আমাদের রাজবাড়িতে তোর মতো গন্ডা-গন্ডা দাসী। তারাও তোর চেয়ে বেশি পরিষ্কার।”

দেবযানী বলল, “এঃ, ভারী তো রাজবাড়ির গর্ব করছিস। আমার বাবা ইচ্ছে করলে ওরকম কত রাজবাড়িতে থাকতে পারতেন, তোর বাবা আমার বাবার সামনে সব সময় হাতজোড় করে কথা বলেন না? তুইও তাই করবি।”

শর্মিষ্ঠা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “আমার বাবা হাতজোড় করে থাকেন? বাবা বসেন সিংহাসনে, তোর বাবা বসেন তাঁর পায়ের কাছে। আমার বাবার দয়াতেই তো তোরা বেঁচে আছিস। না হলে তোরা তো ভিখিরি, খেতে পেতিস না। এ রকম পোশাকই বা পেতিস কোথায়।”

ঝগড়া, গালাগালি চলতে-চলতেই শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি। দেবযানী একা আর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে অনেক দাসী। অনেকে মিলে দেবযানীকে ঠেলতে-ঠেলতে একটা শুকনো কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল।

তখন কয়েকটি মেয়ে ভয় পেয়ে বলে উঠল, “এই রে, এখন কী হবে?”

কিন্তু শর্মিষ্ঠার মাথায় তখন এমন আগুন জ্বলছে যে, সে বলল, "বেশ হয়েছে। দ্যাখ তো, মরে গেল নাকি?"

কুয়োর মধ্যে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে দেবযানী। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

ঠোঁট উলটে শর্মিষ্ঠা বলল, "মরেই গিয়েছে। ঠিক হয়েছে। চল, চল, বাড়ি চল।"

দেবযানীকে সেই কুয়োর মধ্যে ফেলে রেখে সদলবলে চলে গেল শর্মিষ্ঠা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল দেবযানীর। প্রথমে সে বুঝতেই পারল না যে, সে কোথায়? অন্ধকার প্যাচপেচে জায়গা। উঠে দাঁড়িয়েও উপরের দিকে তার হাত পৌঁছল না। এখান থেকে সে উদ্ধার পাবে কী করে?

কান্না এসে গেল তার। সে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

প্রায় এক প্রহর পরে সেই কুয়োর কাছাকাছি শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর। এক রাজা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে শিকার করতে-করতে চলে এসেছেন সেখানে।

এই রাজার নাম যযাতি। প্রথমেই যাঁর কথা বলেছি।

শৌনক ঋষির যজ্ঞের কাছে অনেক মুনি-ঋষি যেখানে সৌতির মুখ থেকে গল্প শুনছিলেন, সেখানে দু'-একজন ঋষি এই সময়

বললেন, "সৌতি, তুমি যে বলছিলে, জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে আকাশ থেকে অনেক সাপ টপাটপ খসে পড়ছিল আগুনে, সেখানে তারপর কী হল?"

আর-একজন ঋষি হইহই করে বললেন, "না, না, আমরা যযাতির গল্পটাই আগে শুনতে চাই।"

আমরাও যযাতির কাহিনিই অনুসরণ করব।

॥ ৩ ॥

যযাতি মহাশক্তিশালী রাজা। অনেক যুদ্ধ তিনি জয় করেছেন। আবার ভাল-ভাল খাদ্য, আনন্দ-ফুর্তিও পছন্দ করেন খুব। যখন যুদ্ধটুদ্ধ থাকে না, সেই সময় তিনি দলবল নিয়ে শিকার করতে বেরোন।

সেদিনও শিকার তাড়া করতে-করতে এক জায়গায় এসে তিনি শুনতে পেলেন, কোথায় যেন একটি মেয়ে কাঁদছে। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। কী আশ্চর্য, কান্নার শব্দটা আসছে কোথা থেকে?

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছেন বলে রাজার তেষ্টাও পেয়েছে খুব। একটু দূরে একটা কুয়ো দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন, কান্নার শব্দটা আসছে ওই কুয়োর মধ্যে থেকে। একটি মেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, "উঃ, আর পারছি না, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে!"

যযাতি উঁকি দিয়ে দেখলেন, সে কুয়োতে জল নেই, তলায় বসে আছে একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে।

যযাতি অবাক হয়ে বললেন, "কে তুমি? উঠে দাঁড়াও, একটা হাত উঁচু করো, আমি ধরছি।"

দেবযানী ডান হাতটা তুলতেই রাজা তাকে ধরে টেনে তুললেন উপরে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে? তোমার এই অবস্থা হল কী করে?"

কান্না থামিয়ে দেবযানী বলল, "আমি দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে। ওই দৈত্যদের রাজকন্যা আমাকে এই কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।"

রাজা যযাতি আর কিছু শুনতে চাইলেন না। তৃষ্ণায় তাঁর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে বললেন, "তোমার হাত-পা কিছু ভাঙেনি তো? এবার বাড়ি যাও!"

তিনি জলের খোঁজে চলে গেলেন সেখান থেকে।

দেবযানীর হাত-পা কিছু ভাঙেনি বটে, কিন্তু অপমানে, রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার মন ভেঙে গিয়েছে। সে আর বাড়ি ফিরতে চাইল না, বসে রইল সেইখানেই।

কিন্তু একসময় তো বাড়িতে তার খোঁজ পড়বেই। কোথায় গেল

দেবযানী? কয়েকজন তাকে খুঁজতে বেরোল। তাদের মধ্যে এক দাসী সেই কুয়োর ধারে দেখতে পেল তাকে। সে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে আর কান্না গড়াচ্ছে তার দু' চোখ দিয়ে।

দাসী ব্যাকুল ভাবে দেবযানীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে বলল, "না, আমি যাব না। তুই বাবাকে গিয়ে বল, রাজার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আমার এই দশা করেছে। আমি ওই রাজার রাজ্যে আর পা দেব না। এখানেই না হয় মরব।"

দাসীর মুখে এ-কথা শুনেই ছুটে এলেন শুক্রাচার্য সেখানে।

দেবযানী প্রথমে বাবার বুকে মাথা দিয়ে আবার কাঁদল। তারপর আস্তে-আস্তে জানাল সব ঘটনা।

শেষকালে সে বলল, "বাবা, আমার সবচেয়ে অপমান হয়েছে কোন কথা শুনে জানো? ওই মেয়েটা বলেছে, তুমি নাকি ওর বাবার পায়ের কাছে বসে থাকো। তুমি নাকি রাজার অন্নদাস, রাজা দয়া না করলে আমরা নাকি খেতেই পাব না। এসব যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি আর বাঁচতে চাই না।"

সব শুনে শুক্রাচার্য একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "না রে মা, ওসব সত্যি নয়। দেবতা কিংবা দানব সকলে আমার ব্রহ্মতেজের কথা জানেন। আমি মৃত মানুষদের বাঁচাতে পারি, আবার সব কিছু ধ্বংসও করে দিতে পারি। মানুষের উপকারের জন্য আমি

বৃষ্টি নামাই, গাছপালাগুলো সতেজ হয়। দৈত্যদের রাজা আমাকে খুবই সম্মান করেন, তাই আমি এখানে আছি। ওই মেয়েটি ঝগড়া করে রাগের মাথায় যেসব বলেছে, তা একেবারেই সত্যি নয়। ও নিয়ে তুই আর মাথা ঘামাস না। ওকে ক্ষমা করে দে। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখতে নেই। বরং ক্ষমা করলেই শান্তি পাওয়া যায়।”

দেবযানী বলল, “আমি ওসব বুঝি না। আগে ওরা ক্ষমা চাইবে, তারপর তো আমরা ক্ষমা করব কিনা ভেবে দেখব। ওরা যদি ক্ষমা না চায়, তা হলে আমি কিছুতেই আর ও রাজ্যে যাব না। বরং এখানে মরব, তাও ভাল।”

মেয়েকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে শুক্রাচার্য চলে এলেন রাজসভায়। রাজা বৃষপর্বাকে বললেন, “রাজন, তোমার লোকরা আমার শিষ্য কচকে বারবার মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, সেটা খুবই অন্যায়, তবু আমি তোমাকে কিছু বলিনি। এখন তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আমার মেয়ে দেবযানীকে চরম অপমান করেছে, আমার সম্পর্কেও বলেছে যে, আমি নাকি তোমার অন্নদাস। এর পর আর আমার এ রাজ্যে থাকা চলে না। আমি চললাম।”

ভয়ে কেঁপে উঠলেন দানবরাজ। দেবতারা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র পেয়ে গিয়েছেন, এখন তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। এর পর যদি শুক্রাচার্য চলে যান, তা হলে মহাবিপদ হবে।

হাতজোড় করে কাতরস্বরে অসুররাজ বললেন, "গুরুদেব, এ আপনি কী বলছেন? এই রাজ্যের যত ধনসম্পত্তি সব কিছুই আপনার অধীন। আমিও আপনার সেবক। আমার অবুঝ মেয়ে কী বলেছে না বলেছে, তা আপনি গ্রাহ্য করবেন না।"

শুক্রাচার্য বললেন, "ওসব বললে তো হবে না। তুমি আমার মেয়েকে শান্ত করতে পারবে কিনা দ্যাখো। নইলে তার সঙ্গে আমি এ রাজ্য ছেড়ে অবশ্যই চলে যাব।"

রাজা বৃষপর্বা তক্ষুনি সদলবলে বনের মধ্যে গিয়ে দেবযানীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তোমার সামনে বলছি, এই রাজ্যের সব কিছু তোমার বাবার অধীন। তুমি আমার মেয়েকে আর আমাকে ক্ষমা করো।"

দেবযানী তবু চুপ করে রইল।

বৃষপর্বা আবার বললেন, "সেজন্য তুমি যা চাও, পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা থেকে আমি তোমার জন্য এনে দিতে পারি।"

দেবযানী এবার বলল, "আমি চাই, শর্মিষ্ঠা আজ থেকে আমার দাসী হয়ে থাকবে, তার সঙ্গে আরও অনেক অসুরকন্যা দাসী হয়ে এসে আমার সেবা করবে। আমি যেখানে যাব, তারাও আমার সঙ্গে যাবে।"

বৃষপর্বা বললেন, "তাই হবে। আমি এক্ষুনি শর্মিষ্ঠাকে পাঠাচ্ছি।"

বাবার আদেশ শুনে শর্মিষ্ঠা তা অমান্য করতে সাহস পেল না। সে বুঝতে পারল, রাগের মাথায় দেবযানীকে কুয়োয় ফেলে দেওয়া অন্যায় হয়েছে। এখন শুক্রাচার্য যদি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান, তা হলে তার বাবা ও দেশবাসীর মহাক্ষতি হবে।

শর্মিষ্ঠা হয়ে গেল দেবযানীর দাসী।

এর পর দেবযানী যখন জঙ্গলে নাচ-গান করতে যায়, তার সঙ্গে-সঙ্গে আসে শর্মিষ্ঠা ও অন্য দাসীরা। দেবযানীই এখন রানির মতন।

একদিন আবার সেই বনের মধ্যে এসে পড়লেন এক রাজা, সঙ্গে দলবল। দেবযানী দেখামাত্র চিনতে পারল, এই সুপুরুষ রাজাই তাকে উদ্ধার করেছিলেন কুয়ো থেকে। রাজা যযাতি কিন্তু দেবযানীকে ঠিক চিনতে পারলেন না। অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিলেন তো।

দেবযানীই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করল রাজার সঙ্গে। জানাল সেদিনের কথা। দাসীদের সে আদেশ করল, রাজাকে ফলমূল-জল দেওয়ার জন্য।

এর পর রাজা কয়েকদিন তাঁবু গেড়ে রইলেন সেখানে। দেবযানীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। দেবযানীর সঙ্গে রাজার বিয়েও হল, তিনি তাকে নিয়ে গেলেন নিজের রাজধানীতে। সঙ্গে শর্মিষ্ঠা আর অন্য দাসীরাও গেল।

সেকালে একজন পুরুষ মানুষের দু'-তিনটি বউ থাকতে পারত।

এখন আর ওসব হয় না। সেকালের রাজারা আবার ইচ্ছে করলে দু'শো-তিনশো জন মেয়েকেও বিয়ে করতে পারতেন। কখনও একজন মেয়েকে বিয়ে করলে তার দাসীরাও আপনাআপনিই বউয়ের মতো হয়ে যেত।

সেই হিসেবে শর্মিষ্ঠাও হল যযাতির এক স্ত্রী। কিন্তু তার রাজপুরীতে স্থান হল না। দেবযানীর আদেশে অশোকবনে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে দেওয়া হল শর্মিষ্ঠার জন্য।

কয়েক বছর পরে দেবযানীর দু'টি ছেলে জন্মাল আর শর্মিষ্ঠার ছেলে হল তিনটি। এর মধ্যে দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার মাঝেমধ্যেই ঝগড়া হত, এবার সে খুব রেগে গেল। সে পাটরানি, তার ছেলে হল দু'টি আর দাসী শর্মিষ্ঠার একটি বেশি। রাজা কি শর্মিষ্ঠাকে বেশি ভালবাসছেন? রাজার ব্যবহারও যেন কেমন-কেমন!

রাগে, দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে দেবযানী নালিশ জানাল বাবার কাছে গিয়ে। শুক্রাচার্য খুব বিরক্ত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি আমার মেয়ের উপর অবিচার করেছ। আজ থেকে তুমি বুড়ো হয়ে যাও। তুমি আর কিছুই করতে পারবে না।"

অমন সুন্দর, সুঠাম চেহারা যযাতির, সেই মুহূর্তে তিনি একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে গেলেন। শুক্রাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইবারও সময় পেলেন না।

কয়েকটা দিন রাজা খুব মনমরা হয়ে রইলেন। তাঁর মনটা তো বুড়ো হয়নি, শরীরটাই শুধু অথর্ব হয়ে গিয়েছে। অথচ এখনও তাঁর অনেক কিছু করার ইচ্ছে।

অভিশাপ দেওয়ার পর শুক্রাচার্য বলেছিলেন, রাজার আগেকার চেহারা ফিরে পাওয়ার একটাই উপায় আছে। যদি অন্য কেউ নিজের আয়ু ও যৌবন ধার দিতে চায়, তা হলে রাজা আবার যুবক হতে পারবেন, আর যে আয়ু দেবে, সে বুড়ো হয়ে যাবে।

রাজা তাঁর সব ছেলেদের ডাকলেন। প্রথমে বড় ছেলে যদুকে ডেকে বললেন, "শোন, তুই কয়েকটা বছরের জন্য তোর যৌবন আমাকে দিবি? আমার অনেক কাজ বাকি আছে। আরও অনেক কিছু ভোগ করতে ইচ্ছে করে। এর বদলে তুই যা চাইবি, তাই-ই দেব।"

যদু তা শুনেই বলল, "না,না, আমি এক্ষুনি বুড়ো হতে যাব কেন? আমার বুঝি ভাল-ভাল খাবার খেতে আর ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না? বুড়ো হলে সেসব কিছুই পারব না। আমাকে এই অনুরোধ করবেন না।"

যযাতি তখন তাঁর অন্য ছেলেদেরও এই একই অনুরোধ করতে লাগলেন। চার ছেলেই বলল, তারা অল্পবয়সে বুড়ো হতে রাজি নয়। একেবারে ছোটছেলে, শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু কিন্তু এই কথা শোনামাত্র

রাজি হয়ে গেল। তারপরেই পুরু হয়ে গেল বৃদ্ধ আর বাবা যযাতি তক্ষুনি হয়ে গেলেন অল্পবয়সি যুবক।

সেই অবস্থায় যযাতি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর পুরু অসুস্থ বুড়োদের মতো শুয়ে থাকে খাটে।

এইভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর।

মহাভারতে কথায়-কথায় এক হাজার বছর, দশ হাজার বছর বলা হয়ে থাকে। তা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি। আমরা তো এখন জানি, মানুষ অতদিন বাঁচে না। তাই শূন্যগুলো কয়েকটা কমিয়ে দিতে হবে।

ধরা যাক, বছর দশেক বাদে রাজা যযাতি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যত ইচ্ছে খাওয়াদাওয়া, ভোগবিলাসিতা, শিকার আর ভ্রমণের পর যযাতি বুঝলেন, মানুষের কোনও কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সবসময় মনে হয়, আরও চাই, আরও চাই। এই চাওয়ার যেন শেষ নেই। আবার এর মধ্যে একঘেয়েমিও এসে পড়ে।

তাই যযাতি একদিন পুরুর কাছে এসে বললেন, "পুত্র, আমি তোমাকে তোমার যৌবন ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমি যথেষ্ট ভোগ করেছি, আমার আর কিছু চাই না। আমি সিংহাসন ছেড়ে চলে যাব। আজ থেকে তুমিই হবে রাজা!"

রাজার এই ঘোষণা শুনে মন্ত্রীটন্ত্রি প্রত্যেকেই আপত্তি জানালেন। নিয়ম অনুযায়ী বড়ছেলেরই রাজা হওয়ার কথা।

কিন্তু যযাতি কারও কথা শুনলেন না। বড় ছেলে কিংবা আর কোনও ছেলেই তাঁর কথা শোনেনি। একমাত্র পুরুই বিনা বাক্যে বাবার ইচ্ছে পূরণ করেছিল। পুরুই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। পুরুর মাথায় তিনি পরিয়ে দিলেন রাজমুকুট। আর পুরুও তখন থেকে হয়ে গেল আগেকার মতো যুবক। বৃদ্ধ হয়ে গেলেন যযাতি।

এর পরেও যযাতি অনেক কাণ্ড করেছেন। সে সবে আর আমাদের দরকার নেই।

পুরু বেশ শান্তশিষ্ট রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে তেমন কোনও গল্প নেই। তবু তাঁর কথা বলতে হয় বিশেষ কারণে। মহাভারতের মূল গল্প কৌরব আর পাণ্ডবদের নিয়ে। তাদের কথা বলতে দেরি হয়ে যাবে। যযাতি আর পুরুর বংশেই সেই কৌরব আর পাণ্ডবদের জন্ম।

পুরুর বংশে পরপর কয়েকজন রাজা তেমন কিছু বিখ্যাত হননি। তারপর এক রাজা হলেন, তাঁর নাম দুষ্মন্ত। তিনি খুব বিখ্যাত। তাঁকে নিয়ে একটা চমৎকার গল্প আছে।

তখনকার দিনে বনের মধ্যে অনেক মুনি-ঋষির আশ্রম থাকত। সেইরকমই ছিল কণ্ব নামের এক মুনির আশ্রম। ভারী সুন্দর সেই আশ্রমের পরিবেশ। সেখানে হরিণ, ময়ূররা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাদের কিছু বলে না। সেখানে রাজাদেরও শিকার নিষেধ। এমনকী, সেখানে কেউ একটা গাছের ডালও ভাঙে না।

রাজা দুষ্মন্ত একবার শিকারে বেরিয়ে একটা হরিণকে তাড়া করতে-করতে পৌঁছে গেলেন সেই আশ্রমের কাছে। সেখানকার সুন্দর গাছপালা আর ফুল-ফল দেখে রাজা বুঝতে পারলেন, এটা একটা আশ্রম, এখানে শিকার করা উচিত নয়। তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বললেন। আর নিজে পায়ে হেঁটে ঢুকলেন আশ্রমের মধ্যে।

এইসব আশ্রমকে বলে তপোবন। কয়েকটা কুটিরের মধ্যে থাকেন আশ্রমের মানুষজন। রাজা সেই তপোবনের শোভা দেখতে-দেখতে একটা কুটিরের সামনে দাঁড়ালেন। এ পর্যন্ত কোনও মানুষজন তাঁর চোখে পড়েনি। কণ্বমুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অন্য কোথাও গিয়েছেন। ওই কুটিরে রয়েছে কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা। তার মতো রূপসি মেয়ে এ পৃথিবীতে আর নেই বললেই চলে। রাজার ডাক শুনে বেরিয়ে এল শকুন্তলা।

আমরা এই গল্পটা একটু সংক্ষেপে শুনব। নইলে আসল গল্পে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। মহাকবি কালিদাস মহাভারতের এই কাহিনিটা নিয়ে আলাদা একটা নাটক লিখেছেন। তার নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। তাতে মহাভারতের ঘটনার চেয়ে আরও অনেক কিছু আছে, আর তা অতি চমৎকার। সারা পৃথিবীতেই এই নাটকটি বিখ্যাত। আমরা পরে সেই বই পড়ে নেব।

মোট কথা, এরপরে শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হল রাজা দুষ্মন্তের। তাঁদের এক সন্তান জন্মাল, তার নাম ভরত। এই ভরত বিশাল রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর বংশধরদের নিয়েই শুরু হবে আমাদের আসল গল্প।

এই বংশের এক রাজার নাম কুরু। তিনিও খুব বড় রাজা। কুরু বংশধরদের বলে কৌরব। আমাদের আসল গল্পের চরিত্ররাও সকলেই ছিল কৌরব। পরে তারা দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

কৌরব বংশে কয়েক পুরুষ বাদে এলেন আর-এক রাজা। তাঁর নাম শান্তনু। এই বার আসল গল্পের শুরু।

অন্য অনেক রাজার মতো শান্তনুও শিকার করতে ভালবাসেন খুব। তিনি এখনও বিয়ে করেননি, তাই রাজপুরীতে তাঁর মন টেকে না। কোনও মেয়েকেই তাঁর পছন্দ হয় না বিয়ের জন্য। শিকার নিয়েই মত্ত হয়ে থাকেন।

রাজা শান্তনু একদিন শিকার করতে-করতে পৌঁছে গেলেন এক নদীর ধারে। জলে নেমে জল খেতে গিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কাছেই বসে আছে একটি ফুটফুটে মেয়ে। যেমন তার সুন্দর পোশাক, তেমনি তার অপরূপ রূপ। শান্তনুর মনে হল, তিনি এমন সুন্দর মেয়ে আগে কখনও দেখেননি।

তিনি কাছে এসে মেয়েটিকে নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি

কে? কোথা থেকে এসেছ? এখানে বসে আছ কেন?"

মেয়েটি মৃদু-মৃদু হেসে বলল, "এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি এমনিই বসে থাকতে পারি না?"

রাজা বললেন, "তোমাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি এদেশের রাজা, আমার নাম শান্তনু।"

মেয়েটি বলল, "আপনার কথা জানি। আপনার অনেক গুণ, আপনি ভালমানুষ, আপনি কারও উপর জোর করেন না। আপনাকে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনাকে আমার একটা শর্ত মানতে হবে।"

রাজা ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কী শর্ত বলো?"

মেয়েটি বলল, "আপনি আমার পরিচয় জানতে চাইবেন না! আপনার রানি হয়ে আমি সব সময় আপনার সেবাযত্ন করব। তবে আমার কোনও কাজে আপনি বাধা দিতে পারবেন না। যদি বাধা দেন, তা হলেই কিন্তু সেদিন আমি চলে যাব। কোনওমতেই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করতে পারবেন না।"

রাজা এতই মুগ্ধ যে, সেই শর্তেই রাজি হয়ে গেলেন।

সেই রহস্যময়ী মেয়েটি রাজা শান্তনুর রানি হয়ে চলে এলেন রাজপুরীতে।

তাঁর যেমন সুন্দর রূপ, তেমনই সুন্দর ব্যবহার। সকলে তাঁকে ধন্য-ধন্য করে। রাজার সেবাযত্নেরও কোনও ত্রুটি করেন না রানি।

এক বছর কেটে যাওয়ার পর সেই রানির একটি পুত্রসন্তান হল। তখন তিনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। সদ্য জন্মানো শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি নদীর জলে ফেলে দিলেন!

শিউরে উঠলেন রাজা। কোনও মা কি তার সন্তানকে ইচ্ছে করে জলে ডুবিয়ে দিতে পারে? ওইটুকু বাচ্চা, ও তো এক্ষুনি মরে যাবে।

রাজা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল শর্তের কথা। তিনি তো বাধা দিতে পারবেন না।

পরের বছরও সেই একই ব্যাপার। আবার একটা ছেলে, আবার রানি তাকে ফেলে দিলেন নদীতে। রাজার বুক দুঃখে-কষ্টে ভরে গেলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। রানির আর কোনও দোষ নেই, শুধু এই নিষ্ঠুর কাণ্ডটির কোনও কারণই বোঝা যায় না।

এইরকম ভাবে পরপর সাতটি ছেলে জন্মাবার পরেই ডুবে গেল নদীতে।

আট বারের বার যখন আবার একটি ছেলে হল, রানি তাকেও নিয়ে চললেন নদীর দিকে, তখন রাজা শান্তনু আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি রানির সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বললেন, “রানি, তোমার এত গুণ, তবু তুমি এই নিষ্ঠুর কাজটি কেন করো?

মা হয়ে কেউ কি সন্তানকে মেরে ফ্যালে? আমার একটি ছেলেও বেঁচে থাকছে না, তাতে যে কষ্টে আমার বুক ভেঙে যায়, তা কি তুমি বুঝতে পারো না? এই ছেলেকে আমি মরতে দেব না!”

রানি হেসে বললেন, “রাজা, আপনি শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আমি তো আর থাকতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনি এই ছেলেটিকে রাখতে চান, রাখুন। এ ছেলের জন্য আপনার বংশ ধন্য হবে।”

রাজার কোলে শিশুটিকে দিয়েই রানি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এবার তো সকলের মনে হবেই, কে ওই রহস্যময়ী রমণী।

আমাদের দেশে সবচেয়ে যে পবিত্র নদী, তার নাম গঙ্গা। এই গঙ্গা নদী আসলে এক দেবীর অংশ, সেই দেবীর নামও গঙ্গা নদী, তিনি থাকেন স্বর্গে।

তিনি পৃথিবীতে এই অদ্ভুত কাণ্ডটি করলেন কেন?

স্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও কয়েকটি শাখা আছে। একটি শাখার নাম বসু।

আমরা ছেলেবেলায় এক-দুই-তিন সংখ্যা মুখস্থ করার জন্য একটি ছড়া বলতাম। এখন বোধ হয় সেই ছড়াটি শেখানো হয় না। ছড়াটা এইরকম: এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিন-এ নেত্র, চার-এ চতুর্বেদ, পাঁচ-এ পঞ্চবাণ, ছয়ে ঋতু, সাত-এ সমুদ্র, আট-এ অষ্ট বসু, নয়ে নবগ্রহ, দশ-এ দিক। এর মানে হল চাঁদ একটা, মাসে দু'টি পক্ষ,

অর্থাৎ অমাবস্যা আর পূর্ণিমা, তিন-এ নেত্র, এটা বোঝা একটু শক্ত। আমাদের তো দু'টো চোখ। নেত্র মানে চোখ। কিন্তু কোনও-কোনও দেবতার তিনটে চোখ থাকে। শিবঠাকুরের মূর্তি কিংবা ছবির কপালে একটা চোখ আঁকা থাকে। আর আমাদের প্রধান গ্রন্থ বেদ-এর চারটে ভাগ। আর মদন নামে একজন দেবতার আছে পঞ্চবাণ। আর আমাদের ঋতু তো ছ'টা, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত। পৃথিবীতে বড়-বড় সমুদ্র সাতটা। আর অষ্ট বসু মানে বসু আট জন। নবগ্রহ মানে আকাশে সূর্যের ন'টি গ্রহ। আর দিক হচ্ছে দশটি, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ইত্যাদি।

আকাশের দেবতারা মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসতেন। এই আটজন বসুও বউদের সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে এসে একটা কুকীর্তি করেছিলেন।

সেকালের ঋষিদের মধ্যে খুব বড় একজন ঋষি ছিলেন বশিষ্ঠ। তিনি মহাজ্ঞানী ও গুণী তো বটেই, এমনিতেও ভালমানুষ। সহজে রাগতেন না। কিন্তু রাগলে তিনি সাংঘাতিক অভিশাপ দিতে পারতেন।

তাঁর আশ্রমে একটি গোরু ছিল, তার নাম সুরভি। আর-এক নাম নন্দিনী। এ রকম গোরু সারা পৃথিবীতে আর একটাও ছিল না। সেই সুরভি ইচ্ছে করলে দশ হাজার লোকেরও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। গোরুটিকে দেখতেও অপূর্ব।

আট জন বসু তাঁদের বউদের নিয়ে বেড়াতে এসে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে সুরভিকে দেখতে পেলেন। দ্যু নামে একজন বসুর স্ত্রী ওই নন্দিনীকে দেখে আবদার করলেন, “ওই অসাধারণ গোরুটা আমাদের চাই। নিয়ে চলো না!”

দ্যু দেখলেন, সামান্য একজন ঋষির আশ্রম, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। গোরুটিকে নিয়ে তো যাওয়াই যায়। বউয়ের আবদার মেটাবার জন্য অন্য বসুদের বললেন সেই কথা। তাঁরাও রাজি। তাঁরা তো জানেন না, এর আগে একবার বিশ্বামিত্র, তখনও তিনি ঋষি হননি, রাজা ছিলেন, ওই সুরভিকে জোর করে নিয়ে যেতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলেন! সেবারই তিনি বুঝেছিলেন যে, রাজাদের চেয়েও ঋষিদের শক্তি কত বেশি। তারপর থেকেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার জন্য জেদ ধরেছিলেন।

বশিষ্ঠ ঋষি তখন আশ্রমে ছিলেন না। বসুরা সহজেই সুরভিকে ধরে নিয়ে গেলেন। বশিষ্ঠ ফিরে এসে যোগবলে সব জানতে পারলেন। তিনি তো সুরভিকে ফিরিয়ে আনলেনই, তা ছাড়া বসুদের তিনি অভিশাপ দিলেন, ওই বসুদের এবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, এখানকার সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে।

বসুদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

স্বর্গে কতরকম আনন্দ, সেখানে কতরকম আরাম, ইচ্ছেমতো সবরকম

খাবার পাওয়া যায়। বয়স বাড়ে না। তার বদলে পৃথিবীতে কখনও খুব শীত, কখনও গরম, কত অসুবিধে। এখানে কাটাতে হবে সারাজীবন?

তাঁরা এসে বশিষ্ঠমুনির কাছে কেঁদে পড়লেন। নিজেদের দোষ স্বীকার করে তাঁরা ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন।

নরম মন ঋষি বশিষ্ঠের। ততক্ষণে তাঁর রাগ পড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, অভিশাপ তো আর ফেরানো যায় না। তবে স্বর্গের কোনও দেবী যদি পৃথিবীতে এসে তাঁদের জন্ম দেন আর তারপরেই জলে বিসর্জন দেন, তা হলে আর তাঁদের পৃথিবীতে থাকতে হবে না।

বসুরা তখন স্বর্গে গিয়ে গঙ্গাদেবীকে কাকুতি-মিনতি করে পৃথিবীতে এসে তাঁদের মা হতে রাজি করালেন।

সেইজন্যই গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে এসে রাজা শান্তনুর রানি হয়েছিলেন। আর সন্তানদের নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কিন্তু একটি সন্তান যে রয়ে গেল?

হাঁ, এঁর নাম দ্যু, এই বসুই স্ত্রীর আবদারে প্রথম সুরভিকে হরণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এঁর দোষই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এঁকে পৃথিবীতে থেকে যেতে হবে। অবশ্য আগেকার কথা তাঁর মনে থাকবে না।

রানি চলে গেলেন, শান্তনু এই ছেলেটিকে রেখে দিলেন। এর নাম দিলেন দেবব্রত।

এই সন্তানটির যেমন তেজ, তেমনই বীরত্বপূর্ণ দেহ। যেমন যুদ্ধবিদ্যায়, তেমনই সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত হল সে।

এই দেবব্রত মহাভারত কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র। তিনি না থাকলে মহাভারতের অনেক ঘটনাই ঘটত না।

আর রাজার পর রাজার বংশের পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। রাজা শান্তনু ও রাজকুমার দেবব্রত। এঁদের নিয়েই আসল গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজকুমার দেবব্রত যেমন রূপবান, তেমনি তাঁর গুণেরও শেষ নেই। সব রাজকুমারকেই তো যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়, দেবব্রত সবরকম অস্ত্রচালনায় আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন। দেবব্রতর আবার পড়াশোনায় খুব মাথা। তখনকার দিনে যত শাস্ত্র ছিল, তাও তিনি জেনে নিলেন গুরুদের কাছে। অর্থাৎ এই রাজকুমার যেমন জ্ঞানী, তেমনি বীর।

এঁকে নিয়ে রাজা শান্তনুর গর্বের শেষ নেই। শান্তনুর পরে দেবব্রতই হবেন রাজা, তাই তাঁর নাম যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হল।

তারপরেই হল একটা কাণ্ড!

রাজা শান্তনুর মনে যতই সুখ থাকুক, একটা দুঃখও ছিল। তাঁর যে কোনও রানি নেই। গঙ্গা তো চলে গিয়েছেনই অনেক আগে। রাজা

সেইজন্যই মাঝে-মাঝে একা-একা ঘুরে বেড়ান।

একদিন তিনি যমুনা নদীর ধারে এক জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে কীসের যেন গন্ধ পেলেন। ভারী সুন্দর গন্ধ, কোথা থেকে গন্ধটা আসছে? খুঁজতে-খুঁজতে রাজা দেখলেন, নদীর ঘাটে একটা নৌকোর উপর বসে আছে একটি মেয়ে। তার গা থেকেই কোনও অচেনা ফুলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে সব দিকে।

খুব অবাক হয়ে শান্তনু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে? এখানে বসে আছ কেন?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম সত্যবতী। আমি ধীবরকন্যা। আমার এই খেয়ানৌকোয় আমি মানুষদের এপার-ওপার করি।"

ধীবর মানে যারা মাছ ধরে। এখন যাদের বলে জেলে। তাদের গায়ে মাছ-মাছ গন্ধ হয়। তাই রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার গায়ে এত সুন্দর গন্ধ হল কী করে?"

সত্যবতী বলল, "এক ঋষি একদিন আমার এই নৌকোয় যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বর দিয়েছেন।"

পৃথিবীর আর কোনও মেয়ের গা থেকে তো এত সুন্দর গন্ধ বেরোয় না। আর সত্যবতীকে দেখতেও বেশ সুশ্রী। তাই রাজা ঠিক করলেন, তিনি এই মেয়েটিকেই বিয়ে করবেন।

তক্ষুনি রাজা গিয়ে দেখা করলেন সত্যবতীর বাবার সঙ্গে।

দেশের রাজা স্বয়ং এসে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন, তা শুনে তো যে-কোনও মেয়ের বাবাই দারুণ আনন্দিত হন। এই ধীবরও খুশি হলেন ঠিকই, কিন্তু এঁর স্বার্থবুদ্ধিও খুব প্রখর।

তিনি হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, "মহারাজ, আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন, সে তো আমাদের পক্ষে মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা আছে। আপনি আগে কথা দিন, তাতে রাজি হবেন?"

রাজা তো ইচ্ছে করলে যে যা চায়, সবই দিতে পারেন। তবু তিনি বললেন, "আগে তোমার প্রার্থনা শুনি, তার আগে কথা দেব কী করে?"

ধীবর বললেন, "মহারাজ, আমার প্রার্থনা এই যে, বিয়ের পরে আপনাদের যে সন্তান হবে, আমার মেয়ের সেই সন্তানই হবে আপনার পরে এই দেশের রাজা!"

শান্তনুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা!

কুমার দেবব্রত তাঁর এত প্রিয়, সে-ও সব দিক থেকে যোগ্য। তাকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর পরে সে-ই হবে রাজা। তার বদলে অন্য কারও কথা ভাবা যায়? অসম্ভব!

শান্তনুর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "না। আমি এ প্রার্থনা মানতে রাজি নই। দরকার নেই এ বিয়ের।"

শান্তনু ইচ্ছে করলে ধীবরের কথা অগ্রাহ্য করে জোর করে সত্যবতীকে বিয়ে করার জন্য নিয়ে যেতে পারতেন। রাজারা তো এ রকম করেই থাকেন। কিন্তু এই রাজা অত্যন্ত ভদ্র এবং সভ্য, তিনি সেরকম কিছু করলেন না। ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

মেয়েটিকে তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাই কয়েক দিন মনখারাপ করে শুয়ে রইলেন, কারও সঙ্গে কথা বললেন না।

মন্ত্রীরা সব খবর পেয়ে যান। কী হয়েছে, তা তাঁরা জেনে গেলেও এই সময় রাজাকে বিরক্ত করতে সাহস করলেন না।

কয়েক দিন বাদে কুমার দেবব্রতও লক্ষ করলেন, বাবা কয়েকদিন রাজকার্যে মন দিচ্ছেন না, বাইরে আসছেন না।

"কী ব্যাপার?" তিনি মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন।

মন্ত্রী বললেন, "কুমার, আপনার পিতার যে কারণে মন খারাপ, তা দূর করার কোনও উপায়ই নেই। বরং কয়েকটা দিন যাক, হয়তো আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।"

দেবব্রত তবু আসল কারণটা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

সব শুনে তিনি বললেন, "ও, এই ব্যাপার। আপনারা চলুন তো আমার সঙ্গে এক্ষুনি।"

মন্ত্রী ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে সদলবলে রাজকুমার দেবব্রত চলে এলেন সেই ধীবরের বাড়িতে।

ধীবরকে নমস্কার জানিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে কুমার দেবব্রত বললেন, "আপনি আমার পিতার কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন, তা আমি শুনেছি। আপনি যা চেয়েছেন, তাই-ই হবে। এখানে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি শপথ করছি, আমি কোনও দিন রাজ্যের রাজা হতে চাই না। কোনও দিন সিংহাসনে বসব না। আমার এ-কথা মিথ্যে হবে না।"

এ কিন্তু তাঁর বাবার আদেশ নয়, দেবব্রত নিজে থেকেই সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিলেন, এ রকম আগে শোনা যায়নি। সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগল।

ধুরন্ধর ধীবরটি এতেও পুরোপুরি খুশি নন। তিনি বিগলিত ভাব দেখিয়ে বললেন, "কুমার, আপনি যা বললেন, তার তুলনা নেই সত্যি। কিন্তু, মানে, আপনি তো সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আপনার ছেলেরা? তারা যদি সিংহাসন চায়?"

কুমার দেবব্রত বললেন, "আমার ছেলে মানে? আমি তো এখনও বিয়েই করিনি। তা হলে শুনুন, আমি আবার শপথ করছি, আমি জীবনে কখনও বিয়েই করব না। তাতে ছেলেটেলের প্রশ্নই উঠবে না।"

তখন উপর থেকে দেবব্রতর মাথায় অনেক ফুল ঝরে পড়ল। তখনকার দিনে কেউ যদি দারুণ কোনও ভাল কাজ করতেন কিংবা

সাংঘাতিক মনের জোর দেখাতেন, তা হলে আকাশ থেকে দেবতারা তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতেন।

এ রকম দু'টো ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য সেদিন থেকে কুমার দেবব্রতর আর-এক নাম হল ভীষ্ম।

এর পর সত্যবতীর বিয়ের ব্যবস্থা হল। রাজা শান্তনু ছেলের এই মহান আত্মত্যাগের কথা শুনে আনন্দে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে ছেলেকে বর দিলেন, তাঁর ইচ্ছামৃত্যু হবে। অর্থাৎ ভীষ্ম যতদিন বাঁচতে চাইবেন, ততদিনই বেঁচে থাকতে পারবেন।

এর পরে মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যাবে, অনেকেই বাচ্চা থেকে বড় হচ্ছেন, বুড়ো হচ্ছেন, তারপর মরে যাচ্ছেন। কিংবা কেউ-কেউ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করছেন, কিন্তু ভীষ্ম ঠিক বেঁচে থাকছেন।

বেশ কিছুদিন শান্তনু ও সত্যবতী সুখে দিন কাটালেন। তারপর স্বর্গে গেলেন শান্তনু। ততদিনে তাঁদের দু'টি ছেলে হয়েছে। তাদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য।

স্বামীর মৃত্যুর পর সত্যবতী সব কিছু ব্যাপারে ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বড়ছেলেটি রাজা হল, তাকে সবরকম সাহায্য করেন ভীষ্ম। এ ছেলেটির অন্য অনেক গুণ আছে, যুদ্ধবিদ্যাও ভাল শিখেছে, কিন্তু একটা দোষও আছে। বড্ড গোঁয়ার আর অহংকারী।

গন্ধর্বদের এক রাজার সঙ্গে একদিন এই রাজার দেখা হল, তাঁরও নাম চিত্রাঙ্গদ। গন্ধর্বরাও অনেকটা দেবতাদেরই মতন, তাঁরাও আকাশে থাকেন, মাঝে-মাঝে আসেন পৃথিবীতে। তাঁকে দেখে এই রাজা বললেন, "তোমার নাম আর আমার নাম এক হবে কেন? আমি কৌরবদের রাজা, আমার রাজ্য কত বড়, তুমি তোমার নাম পালটাও!" গন্ধর্বরাজ তাতে রাজি হবেন কেন? তিনি হেসে বললেন, "তুমি সামান্য মানুষ, তুমিই তোমার নাম পালটাও বরং!" লেগে গেল তর্ক, তারপর দু'জনে তুমুল যুদ্ধ।

ভীষ্ম এ-কথা কিছুই জানতেন না। খবর পেয়ে তিনি এসে পৌঁছবার আগেই কৌরবরাজ যুদ্ধে হেরে গিয়ে প্রাণ দিলেন।

ছোটভাই বিচিত্রবীর্য বেশ ছোট, তাকেই রাজা করলেন ভীষ্ম। ভীষ্ম তো রাজা হবেন না। তাই কিশোর ছেলেটিকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনিই সব রাজকার্য সামলান।

কয়েক বছর পর বিচিত্রবীর্য খানিকটা বড় হতে ভীষ্ম ঠিক করলেন, এবার তার বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু বয়স বাড়লেও তার শরীর বেশ দুর্বল। যুদ্ধ করতেও শেখেনি ভাল ভাবে। নিজে-নিজে বিয়েও করতে পারবে না, ব্যবস্থা করতে হবে ভীষ্মকেই।

এই সময় ভীষ্ম শুনলেন, কাশীর রাজার তিন কন্যার স্বয়ংবর

হবে। তখনকার দিনে রাজারাজড়ার মেয়ের বিয়ের এই বেশ একটা ভাল ব্যবস্থা ছিল। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের স্বামী পছন্দ করতেন। কোনও রাজা তাঁর মেয়ের স্বয়ংবরের কথা ঘোষণা করে দিতেন, অন্য অনেক রাজ্য থেকে রাজা ও রাজকুমাররা উপস্থিত হতেন সে রাজ্যে। নির্দিষ্ট দিনে রাজসভায় তাঁরা সকলে সার বেঁধে বসতেন, মালা হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন রাজকন্যা। এক-একজন রাজা বা রাজকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন বলে দিত, তাঁর কী-কী গুণ আছে, কত বড় রাজ্য, কত ধনসম্পদ ইত্যাদি। রাজকন্যার যাঁকে ভাল লাগত, তাঁর গলায় মালা দিয়ে দিতেন।

কাশীর রাজার ঘোষণা শুনে ভীষ্ম উপস্থিত হলেন সেখানে। বিচিত্রবীর্যকে তিনি সঙ্গে নিলেন না। ওর দুর্বল চেহারা দেখে যদি রাজকন্যাদের পছন্দ না হয়?

স্বয়ংবর সভা শুরু হতে ভীষ্মর মনে একটা খটকা লাগল। এই রে, কোনও রাজকন্যা যদি তাঁর গলায় মালা দিয়ে দেয়! তিনি যেমন রূপবান, তেমনি তেজস্বী, তাঁকে দেখলে রাজকন্যাদের তো পছন্দ হবেই। কিন্তু তিনি তো বিয়ে করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি নিজের জন্যও আসেননি!

ভীষ্মকে দেখেও অনেক রাজা অবাক। কারণ, তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা সকলে জানে।

স্বয়ংবর সভা শুরু হতে-না-হতেই ভীষ্ম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিয়ে করার অনেক রীতি আছে। তার মধ্যে রাজকন্যাদের হরণ করে নিয়ে গিয়েও বিয়ে করা যায়। আমি এই তিন কন্যাকেই হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের কারও তাতে আপত্তি থাকলেও আমি গ্রাহ্য করি না।"

সেই তিনটি মেয়েকেই ভীষ্ম নিজের রথে তুলে নিলেন। অমনি রাজাদের মধ্যে নানা কোলাহল শুরু হয়ে গেল। কেউ-কেউ গালাগালি দিতে লাগল ভীষ্মকে, কেউ-কেউ 'মার, মার' বলে চেঁচাতে লাগল। সকলে মিলে আক্রমণ করতে এল ভীষ্মকে।

কিন্তু এরা তো কেউ ভীষ্মের বীরত্বের কথা জানে না। তিনি তো একাই একশো। সব রাজা একদিক থেকে অস্ত্র ছুড়তে লাগল, ভীষ্ম বাধা দিতে লাগলেন প্রত্যেককে। বেশ কিছুক্ষণ দারুণ যুদ্ধ চলল, অস্ত্রের ঝনঝনা ও মানুষের আর্তনাদে ভরে গেল চতুর্দিক।

শেষ পর্যন্ত সকলে পরাজিত হয়ে পালাল।

নিশ্চিন্ত ভাবে আবার রথ চালাতে লাগলেন ভীষ্ম। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, পালাচ্ছ কোথায়?"

রথ থামিয়ে তিনি দেখলেন, শাল্ব নামে আর-একজন রাজা ধেয়ে

আসছেন। এই রাজারও বীরত্বের খুব খ্যাতি আছে। ভীষ্ম হাসলেন। তিনি পালাবেন?

শুরু হল শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ।

তিন রাজকন্যার মধ্যে একজন ছটফট করে উঠে দাঁড়াতেই ভীষ্ম বললেন, "তোমরা চুপ করে বসে থাকো। তোমাদের কোনও ভয় নেই।"

বিশাল এক হাতির পিঠে চেপে বসে রাজা শাল্ব খুব পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন বটে, কিন্তু ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেবতারাও ভয় পান। ভীষ্মের হাতের প্রত্যেকটা তিরই যেন অগ্নিবাণ।

বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর শাল্বও পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

তিন রাজকন্যাকে নিয়ে ভীষ্ম এসে পৌঁছলেন রাজধানী হস্তিনাপুরে।

কয়েক দিন পর যখন বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু হবে, তখন ওই তিন কন্যার মধ্যে বড় মেয়েটি, যার নাম অম্বা, সে ভীষ্মকে বলল, "আপনাকে আমি একটা কথা জানাতে চাই। আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, স্বয়ংবর সভায় মহারাজ শাল্বর গলাতেই মালা দেব, আমার বাবাও তা জানতেন, তিনিও তাই চেয়েছিলেন। এখন আপনার ভাইকে বিয়ে করা কি আমার উচিত হবে?"

ভীষ্ম বললেন, "তুমি একথা আগে বলোনি কেন? তা হলে তো শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ না করে তোমাকে সেখানেই নামিয়ে দিতাম!"

যাই হোক, অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এর পরেও অবশ্য অম্বাকে নিয়ে অনেক গন্ডগোল হবে, সে আবার কাহিনিতে ফিরে আসবে। তখন তার কথা আবার জানব।

বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বাকি দু'টি রাজকন্যার বিয়ে হল খুব ধুমধাম করে। এর পর কয়েকটি বছর বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটল। তারপর একদিন জানা গেল, এই অল্পবয়সি রাজাটির যক্ষ্মারোগ হয়েছে। সেসময় তো এ রোগের কোনও চিকিৎসাই ছিল না। তার আর বেশিদিন আয়ু নেই।

মহাভারতের কাহিনি তো বিশাল, তাই এর কিছু-কিছু বাদ দিতে হবে। বটগাছের যেমন অনেক ডালপালা হয়, তেমনি এ কাহিনিও ছড়িয়ে গিয়েছে নানা দিকে। কত মুনি-ঋষির জীবনের কথা যে ঢুকে গিয়েছে এর মধ্যে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সেসব জানতে গেলে আসল গল্পের খেই হারিয়ে যায়।

আর কিছু-কিছু ঘটনা আছে, যা বড়দের মতো, ছোটরা ঠিক বুঝবে না। বড় হয়ে মূল মহাভারত পড়ে নিলেই সব জানা যাবে।

এখানে একজন ঋষির কথা অবশ্য বলতেই হবে।

সত্যবতীর বিয়ের আগে একটি সন্তান জন্মেছিল। তার গায়ের রং খুব কালো বলে নাম রাখা হয়েছিল কৃষ্ণ। আর একটা দ্বীপে জন্ম

বলে পুরো নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। এঁর আরও একটা নাম আছে, ব্যাস। পরাশর ঋষির কাছে ইনি পালিত হয়েছেন। আর বড় হয়ে ওঠার পর তিনি হয়েছেন মহাপণ্ডিত। আমাদের দেশে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থের নাম বেদ। এক সময় এই বেদের শ্লোকগুলো নানা ভাবে ছড়ানো ছিল। এই ব্যাস সেইসব শ্লোক কোনটার পাশে কোনটার থাকা উচিত, তা ঠিকঠাক করে চারটে ভাগে ভাগ করলেন। সেই চার খণ্ডের নাম ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব। তাঁর সেই ভাগ এখনও লোকে মেনে নেয়। এ কাজের জন্য তাঁর নাম হয়ে যায় বেদব্যাস।

আমরা তো জানি, এই বেদব্যাসই মহাভারত রচনা করেছেন। পৃথিবীতে এমন লেখক আর-একজনও নেই, যিনি তাঁর কাহিনির মধ্যে নিজেই এসে দেখা দেন মাঝে-মাঝে। অনেক কিছু ঘটছেও তাঁরই জন্য। এসব আমরা জানতে পারব আস্তে-আস্তে।

সত্যবতী তাঁর এই ছেলের কথা আগে কাউকে জানাননি। একসময় তিনি ভীষ্মকে সব কথা খুলে বললেন। ভীষ্ম তো দারুণ অবাক। মহাপণ্ডিত বেদব্যাসের কথা কে না জানে! সেই বেদব্যাস সত্যবতীর ছেলে? তার মানে তিনি তো ভীষ্মেরও একরকম সৎভাই। তক্ষুনি তাঁকে খবর পাঠিয়ে নিয়ে আসা হল রাজধানীতে। তাঁকে অনুরোধ করা হল, সব ব্যাপারে ভীষ্মকে পরামর্শ দিতে ও সাহায্য করতে।

বেদব্যাস রাজি হলেন। তবে তিনি রাজপুরীতে থাকবেন না, তাঁর নিজস্ব আশ্রম আছে। এখানে আসবেন মাঝে-মাঝে।

যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হল কিছুদিনের মধ্যেই। তাঁর দুই ছেলে, ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু।

ধৃতরাষ্ট্র বড়ছেলে, তাঁরই রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ! হায়, হায়, জন্মান্ধ কী করে রাজ্য চালাবে? দ্বিতীয় ছেলেটি এমনিতে ঠিকঠাকই আছে, কিন্তু গায়ের রং কীরকম হলদেটে মতো, সেইজন্য তার নাম রাখা হয়েছে পাণ্ডু।

সত্যবতী আর ভীষ্ম ঠিক করলেন যে, পাণ্ডুকেই রাজা করা হবে। বড়ভাই ধৃতরাষ্ট্রও রাজসভায় বসবেন, রাজার মতন সম্মান পাবেন। দেশের বাইরে যুদ্ধবিগ্রহ চালাতে গেলে রাজা হিসেবে যাবেন পাণ্ডুই।

এবার এই দুই ছেলের বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অন্ধ ছেলের বিয়ে হবে কী করে? রাজার ছেলের সঙ্গে রাজকন্যারই বিয়ে হয়, কিন্তু কোনও রাজকন্যাই তো অন্ধ রাজকুমারকে বিয়ে করতে রাজি হবে না!

ভীষ্ম খবর পেলেন যে, গান্ধার রাজ্যের রাজা সুবলের একটি সুন্দরী কন্যা আছে, তার নাম গান্ধারী। ভীষ্ম রাজা সুবলের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। এ ছেলেটি অন্ধ বটে, কিন্তু আর কোনও খুঁত নেই। শরীরে দারুণ শক্তি, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া এত

বড় একটা রাজ্যের ঠিক রাজা না হলেও রাজারই মতো সম্মান পান। তাঁর স্ত্রী যিনি হবেন, তিনিও রানির মতনই থাকবেন।

মহাশক্তিশালী কৌরব রাজ্য আর বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের কাছ থেকে আসা প্রস্তাব তো সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বললেন, "আমার মেয়ে যদি রাজি থাকে, তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

বাবার মত আছে জেনে গান্ধারীও সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই-ই নয়, গান্ধারী এমন একটা কাজ করলেন, যার কোনও তুলনাই নেই। বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরই তিনি খানিকটা মোটা কাপড়ে তাঁর দু' চোখ বেঁধে ফেললেন। তাঁর স্বামী অন্ধ, তাই তিনিও সারাজীবন কিছু দেখবেন না।

বধূ হিসেবে হস্তিনাপুরে আসার পর তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার ও ধর্মজ্ঞান দেখে সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগল।

এবার পাণ্ডুর বিবাহ। এতে কোনও সমস্যা নেই, রাজা কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা পৃথার স্বয়ংবর সভায় হাজির হলেন পাণ্ডু। অত বড় রাজ্যের রাজা, তা ছাড়া পাণ্ডুর বীরত্বেরও খ্যাতি হয়েছে, সুতরাং তাঁরই গলায় মালা দিলেন রাজকন্যা। এই পৃথারই আর-এক নাম কুন্তী।

পাণ্ডু এর পরেও মদ্র দেশের রাজকন্যা মাদ্রীকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। কিছুদিন পর তিনি বেরোলেন বিজয় অভিযানে।

কয়েকটি রাজ্য জয় করলেন। প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এসে সবই নিবেদন করলেন মা সত্যবতী ও ভীষ্মকে।

এবার তাঁর কিছুদিন ছুটি চাই। সে ক'দিন দাদা বসবেন সিংহাসনে, আসল কাজ তো সবই করবেন ভীষ্ম। দুই স্ত্রীকে নিয়ে পাণ্ডু চলে গেলেন গভীর অরণ্যে।

সেখানে বাতাস নির্মল, ঝরনার জলের কুলুকুলু শব্দ, আর কতরকম পাখির ডাক শুনতে-শুনতে মনটা জুড়িয়ে যায়। রাজ্য চালাবার দায়িত্ব মাথায় নেই। চমৎকার দিন কাটে। খাদ্যেরও অভাব নেই, গাছে-গাছে রয়েছে অনেক ফলমূল আর অজস্র হরিণ দেখা যায়, তার একটাকে মারলেই তো বেশ কয়েক দিন চলে যায়।

একদিন পাণ্ডু দেখলেন, দু'টি হরিণ একটা নদীর ধারে খেলা করছে। দু'টিতে মিলে একবার ছুটে একদিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে এদিকে। পাণ্ডু ধনুক তুলে একটা তির মারলেন, তাতেই একটি হরিণ বিদ্ধ হয়ে মানুষের গলায় আর্তনাদ করে উঠল।

এই রে, এ আবার কী ব্যাপার!

সেই আহত হরিণ বলে উঠল, "ছিঃ মহারাজ, এ কী করলে? খেলার সময় কেউ কাউকে মারে? আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে হরিণের রূপ ধরে খেলা করছিলাম। আমি একজন ঋষি, তুমি আমাকে মেরে মহাপাপ করেছ! ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে অনন্ত নরকবাস হয়। তুমি

জানতে না যে আমি কে, তাই তোমার শাস্তি একটু কমিয়ে দিচ্ছি, তোমার কোনও দিন ছেলেমেয়ে হবে না।”

এই অভিশাপ শুনে পাণ্ডু কেঁপে উঠলেন। তারপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, “হায়, হায়, আমি এ কী করলাম। আমার কোনও দিন সন্তান হবে না? আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল! যে রাজার সন্তান হয় না, তাকে সকলে ছি ছি করে। আমি আর রাজধানীতে যাব না, সংসারেই থাকব না।”

দুই স্ত্রীকে বললেন, “তোমরা ফিরে যাও, আমি এই বনেই থেকে পূজা-প্রার্থনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।”

কুন্তী আর মাদ্রী ফিরে যেতে রাজি নন। তাঁরা থেকে গেলেন রাজার সঙ্গে, রাজধানী হস্তিনাপুরে কেউই আর তাঁদের খবর পান না।

পাণ্ডু পুত্রসন্তানের জন্য রোজই কান্নাকাটি করেন বলে একদিন তাঁর বড়রানি কুন্তী বললেন, “মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি।”

এই কুন্তী মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র। এবারে আস্তে-আস্তে বলতে হবে তাঁর কথা।

কুন্তী যখন কুমারী ছিলেন, তখন তাঁদের রাজ্যে এসেছিলেন দুর্বাসা মুনি। ইনি একটু রেগে গেলেই অভিশাপ দেন, আবার খুশি হলে বর দেন। কুন্তী তাঁর এমনই সেবাযত্ন করেছিলেন যে, তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা

তাঁকে একটা বর দিলেন। ঠিক বর নয়, তিনি কুন্তীকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, “তুমি যদি এই মন্ত্র পড়ে আকাশের কোনও দেবতাকে ডাকো, তা হলেই সেই দেবতা তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবেন, আর তোমাকে একটা উপহার দেবেন।”

দুর্বাসা চলে যাওয়ার পর কুন্তী ভাবলেন, সত্যি-সত্যি একটা মন্ত্র পড়লেই আকাশের দেবতারা নেমে আসবেন? তা কি হয়? আচ্ছা, দেখা যাক তো!

আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে কুন্তী সেই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যদেব এক দীপ্তিমান পুরুষের রূপ ধরে এসে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে।

সূর্যদেব কুন্তীকে প্রশ্ন করলেন, “তুমি আমার কাছ থেকে একটি সন্তান উপহার চাও?”

কুন্তী ভয় পেয়ে গেলেন। এ আবার কীরকম উপহার! তিনি কুমারী, তিনি সন্তান চাইবেন কেন? বিয়ের পরই তো মেয়েরা মা হয়।

তিনি বললেন, “প্রভু, আমি ভুল করেছি। আপনাকে এমনি-এমনি ডেকে ফেলেছি। আমার ওসব কিছু চাই না। আপনি ফিরে যান।”

সূর্যদেব বললেন, “তা তো হয় না। ওই মন্ত্রে একবার ডাকলে ফিরে যাওয়া যায় না। এ উপহার তোমাকে নিতেই হবে। তবে তোমার কোনও ভয় নেই।”

তিনি কুন্তীকে একবার ছুঁয়ে দিয়ে আবার মিলিয়ে গেলেন আকাশে।

কুন্তী গর্ভবতী হলেন এবং কিছুদিন পর তাঁর একটি সন্তান হল। ভারী ফুটফুটে সুন্দর চেহারার ছেলে।

এখন এ ছেলেকে নিয়ে তিনি কী করবেন? বিয়ের আগে কোনও রাজকন্যার সন্তান হলে সকলে খুব নিন্দে করবে। তার আর বিয়েই হবে না। তাই কেউ কিছু জানার আগেই কুন্তী চুপি চুপি একটা ভেলা বানিয়ে তার উপর বাচ্চাটাকে শুইয়ে চাদরটাদর চাপা দিয়ে ভাসিয়ে দিলেন নদীতে। যতদূর দেখা গেল, সেদিকে তাকিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

বাচ্চাটা কিন্তু জলে ডুবল না, মরলও না, ঠিক বেঁচে গেল। তার কথা আবার বলা হবে যথাসময়ে। এর মধ্যে সেই বাচ্চার কথা জানল না কেউ।

এখন কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুকে বললেন, "আমি একটা মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্রে যে-কোনও দেবতাকে ডেকে একটি সন্তান উপহার পেতে পারি।"

তাই শুনে পাণ্ডু বললেন, "অ্যাঁ? এ আবার হয় নাকি? ডাকো তো, ডাকো তো, একজন দেবতাকে এখনই ডাকো।"

একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, স্নানটান করে, শুদ্ধ বসন পরে কুন্তী ডাকলেন ধর্মদেবতাকে। ঋষির সেই মন্ত্রের জোর একটুও কমেনি।

সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ধর্মদেবতা। কুন্তীকে একবার ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে তিনি চলে গেলেন।

যথাসময়ে কুন্তীর একটি সুন্দর ছেলে হল। তার নাম রাখা হল যুধিষ্ঠির।

সন্তান পাওয়া এত সহজ দেখে মহাআনন্দিত ও মহাউৎসাহিত হয়ে পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন, "তুমি আর-একজন দেবতাকে ডাকো।"

কুন্তী এবার ডাকলেন বাতাসের দেবতা পবনকে। অমনি পবনদেব উপস্থিত। তিনিও কুন্তীকে একটি উপহার দিলেন। এবারেও একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছেলে হল, তার নাম দেওয়া হল ভীম।

আবার ডাকা হল দেবরাজ ইন্দ্রকে। ইন্দ্রের আশীর্বাদে যে অপরূপ সন্তানটি জন্মাল, তার নাম হল অর্জুন।

রাজার দ্বিতীয় রানি মাদ্রী এইসব দেখে করুণ ভাবে বললেন, "আমার কি কোনও সন্তান হবে না?"

পাণ্ডু তখন কুন্তীকে বললেন, "তুমি তোমার ওই মন্ত্রের জোরে মাদ্রীকে সন্তান দিতে পারো না?"

কুন্তী বললেন, "পারি। মাদ্রী যে-কোনও দেবতার নাম মনে-মনে চিন্তা করুক, আমি মন্ত্রের জোরে তাঁকে ডেকে আনছি।"

মাদ্রী একটু চালাকি করলেন। দেবতাদের দু'জন চিকিৎসক আছেন, তাঁদের নাম অশ্বিনীকুমার। এঁরা যমজ, আর সব সময় একসঙ্গে থাকেন। মাদ্রী ডাকলেন তাঁদের।

অশ্বিনীকুমাররা এসে মাদ্রীকে আশীর্বাদ করলেন। মাদ্রীর দু'টি সন্তান হল। তাদের নাম রাখা হল নকুল আর সহদেব।

মাদ্রী আবার এক দেবতাকে ডাকতে চাইলেন।

কুন্তী তাঁর স্বামীকে বললেন, "না, আর হবে না, ও কেন একসঙ্গে দু'জন দেবতাকে ডেকেছে?"

পাণ্ডু বললেন, "বেশ। যথেষ্ট হয়েছে। আমার এই পাঁচটি সন্তানই যথেষ্ট।"

দিন-দিন সেই পাঁচটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ছেলে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

ওদিকে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীরও কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি অনেকদিন। সেইজন্য তাঁদের মনে দুঃখ ছিল।

একদিন ব্যাসদেব এলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

সেখানে কয়েকদিন থাকার সময় তাঁর খুবই সেবাযত্ন করলেন গান্ধারী।

তাতে খুবই তৃপ্ত হয়ে ব্যাস গান্ধারীকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কী বর চাও, বলো।"

গান্ধারী বিনীত ভাবে বললেন, "যদি বর দিতে চান, তা হলে দিন, আমি যাতে ছেলেমেয়ের মা হতে পারি।"

সঙ্গে-সঙ্গে বেদব্যাস বললেন, "তথাস্তু। আমার বরে তোমার

একশোটি ছেলে আর একটি মেয়ে হবে।"

এ কী বর দিলেন ঋষি? কোনও মায়ের কি একশো একটি ছেলেমেয়ে হতে পারে? অসম্ভব! বড় জোর পনেরো-কুড়ি।

আগেকার দিনে সব কিছুই খুব বাড়িয়ে বলা হত। কেউ হয়তো খুব কঠোর তপস্যা করলেন পনেরো বছর, বলা হল পাঁচ হাজার বছর। কারও-কারও বয়সই বলা হয়েছে, এক হাজার কি দু' হাজার বছর, তা তো আর হতে পারে না! যাই হোক, গান্ধারীরও বোধ হয় দশ-এগারোটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, সেটাই হয়ে গিয়েছে একশো একটি। যাই হোক, গল্পের খাতিরে আমরা তাই মেনে নিলাম।

ব্যাসদেবের বরে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন কিন্তু সন্তান প্রসব আর হয় না। দু' বছর তারা রয়ে গেল পেটের মধ্যে। তারপর বেরোল একটা প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড। তা দেখে ভয় পেয়ে গান্ধারী কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখন আবার ব্যাসদেব এসে হাজির। তিনি সেই মাংসপিণ্ডটাকে একশো একটা ভাগ করে প্রত্যেকটি টুকরো এক-একটা ঘি-ভরতি হাঁড়িতে রাখতে বললেন। সেই থেকে একশোটি ছেলে আর একটি মেয়ে জন্মাল।

প্রথম ছেলেটি খুবই রূপবান, তার নাম রাখা হল দুর্যোধন। আর মেয়েটির নাম দুঃশলা। অন্যদের মধ্যে তৃতীয় সন্তানটির কথা পরে কয়েকবার এসেছে, বাকিরা সব এলেবেলে।

আবার ওদিকে, অরণ্যের মধ্যে রাজা পাণ্ডু মারা গেলেন হঠাৎ। তখনকার দিনে কোথাও কোথাও সহমরণ প্রথা ছিল। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে এক স্ত্রীও পুড়ে মরতেন। পাণ্ডুর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহমরণে গেলেন তাঁর ছোটরানি মাদ্রী।

কুন্তী পাঁচটি ছেলেকেই মানুষ করতে লাগলেন সমান যত্নে। তারা একটু বড় হওয়ার পর তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ভেবে অরণ্য ছেড়ে ফিরে এলেন রাজধানী হস্তিনাপুরে।

এতদিন ওঁদের কোনও খবরই পাওয়া যায়নি। এখন ওঁদের দেখে রাজ্যের লোকের যেমন দুঃখ হল, আনন্দও হল তেমন। দুঃখের কারণ, রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে। আর আনন্দের কারণ, তাঁর এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান পাঁচটি ছেলে এসেছে রাজ্যে।

সেই শোক ও আনন্দ কেটে গেল ক'দিন পর। তারপর দেখা দিল একটা অতি কঠিন প্রশ্ন। এতদিন তো ভীষ্মই রাজত্ব চালাচ্ছিলেন, সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে। এখন পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে। নতুন রাজা হবে কে?

অন্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর বড়ছেলে তো সিংহাসন দাবি করতেই পারে। আবার পাণ্ডুও রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলেই বা রাজা হবে না কেন? এ বিষয়ে এক-একজনের এক-একরকম মত।

আর একটা প্রশ্ন, দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কে বয়সে বড়? এই বংশের জ্যেষ্ঠসন্তানই রাজা হতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নেরও সঠিক কোনও উত্তর নেই। দুর্যোধন তার মায়ের পেটে দু' বছর আটকে ছিল, তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে যুধিষ্ঠির। মায়ের পেটে যে আগে আসে, সে বড়, না যে পৃথিবীর আলো-বাতাস আগে দ্যাখে, সে বড়?

এ অতি সূক্ষ্ম আর জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়েই একের পর-এক এসেছে মহাভারতের বাকি সব ঘটনা।

॥ ৪ ॥

রাজকুমাররা যে শুধু রাজভোগ খায় আর খেলাধুলো করে সময় কাটায়, তা কিন্তু নয়। ভোরবেলা উঠে তাদের নানারকম ব্যায়াম করতে হয়, তির-ধনুকের যুদ্ধ আর গদাযুদ্ধও শিখতে হয়। অনেক ছবিতে আমরা দেখি রাজকুমাররা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে, মহাভারতের যুগে কিন্তু তলোয়ার ছিল না। ছিল খড়্গ বা খাঁড়া। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ তখনও চালু হয়নি, অবশ্য ঘোড়ায় টানা রথ ছিল। সেই রথ যারা চালাত, তাদের বলা হত সারথি। রাজকুমারদেরও শিখতে হত রথ চালানো।

এ ছাড়া রাজকুমারদের পড়াশোনাও করতে হত। গুরুর কাছে তারা শাস্ত্রের পাঠ নিত। রাজ্য চালাবার যত রকম নিয়মকানুন, তাও জেনে নিতে হত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের তুলনায় রাজকুমারদের যুদ্ধবিদ্যা আর শাস্ত্রজ্ঞানে অনেক উন্নত হতে হত, আর যেসব রাজকুমার এসব পারত না, তারা এলেবেলে হয়ে পিছিয়ে পড়ত।

দুর্যোধন আর তার ভাইরা, যুধিষ্ঠির আর তার ভাইরা সবাই রাজকুমার। সবাই অস্ত্রচালনা শেখা, শাস্ত্রপাঠ আর খেলাধুলো করত একসঙ্গে। তবে সবাই তো সব ব্যাপারে সমান হয় না, ক্রমশ বোঝা গেল তির-ধনুকের যুদ্ধে অর্জুনই সবার চেয়ে ভাল, যুধিষ্ঠিরের ঝোঁক পড়াশোনার দিকে আর গদাযুদ্ধে দুর্যোধন আর ভীম কেউ কাউকে সহজে হারাতে পারে না। এ ছাড়া ভীমের যেমন মস্ত বড় চেহারা, তেমনি তার দারুণ গায়ের জোর। খেলাধুলোর সময় ভীম, কৌরবভাইদের খুব জ্বালাতন করে। মাঝে-মাঝেই ভীম দু' জন জ্যাঠতুতো ভাইকে ধরে মাথা ঠুকে দেয়, কখনও তাদের একজনকে চুলের মুঠি ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরায়, কখনও স্নান করার সময় ভীম একাই জনাদশেক কৌরব রাজকুমারকে চেপে ধরে জলের মধ্যে ঠুসে দেয়। তারা যখন মৃত্যুভয়ে আঁকুপাকু করে, তখন ভীম হাসতে-হাসতে তাদের ছেড়ে দেয়। কৌরবরা যদি খেলার সময় কোনও গাছে ওঠে, অমনি ভীম সেই গাছে এমন জোরে-জোরে লাথি মারে যে, গাছটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। আর কৌরব ছেলেরা টুপটাপ করে খসে পড়ে নীচে, তাতে তাদের হাত-পা মচকায় কিংবা মাথায় চোট লাগে। ভীম এসবই করে মজার জন্য। কিন্তু ভীমের পক্ষে যেটা মজা, অন্যদের কাছে তা খুবই ভয়ের ব্যাপার।

দু' পক্ষের রাজকুমার একসঙ্গেই সব কিছু শিখছে বটে, কিন্তু মনে-

মনে তো তাদের চিন্তা আছে যে, সময় হলে কে হবে রাজা? দুর্যোধন ধরেই নিয়েছে, ধৃতরাষ্ট্রের বড়ছেলে হিসেবে সে-ই রাজা হবে। ওদিকে যুধিষ্ঠিরেরও দাবি কম নয়। এদের যে দু'জন গুরু, সেই কৃপ আর দ্রোণ, পাণ্ডবদেরই বেশি পছন্দ করেন। অর্জুন তো তাঁদের চোখের মণি। আরও অনেকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে। কিন্তু দুর্যোধন ঠিক করেছে, যে যাই বলুক, ছলে-বলে-কৌশলে তাকে রাজা হতেই হবে। এ নিয়ে যদি ঝগড়াঝাঁটি বা লড়াই হয়, তা হলেও দুর্যোধনের ধারণা, অন্য পাণ্ডবভাইদের আটকে রাখা যাবে, শুধু দুশ্চিন্তা ভীমকে নিয়ে। তাকে যে সব কৌরবভাই-ই খুব ভয় পায়।

একদিন গঙ্গার ধারে এক বাগানে সবাই মিলে পিকনিক করতে গেল। ভারী চমৎকার জায়গা, আর প্রচুর খাবারদাবারের ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ খেলাধুলো আর জলে দাপাদাপির পর খাওয়াদাওয়া। সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও ভীমের আর শেষই হয় না। সে যে একাই পনেরো-কুড়ি জনের সমান খাবার খায়। এই সময় দুর্যোধন চুপিচুপি বিষ মিশিয়ে দিল ভীমের খাবারে। সেই বিষাক্ত খাবারও ভীম খেয়ে নিল কিছু সন্দেহ না করে। তারপর একসময় সেখানেই সে ঢলে পড়ে গেল। দুর্যোধন তখন লতাপাতা দিয়ে ভীমের হাত-পা বেঁধে ফেলে দিল গঙ্গায়। ব্যস, নিশ্চিন্ত।

এতেও কিন্তু ভীমের মৃত্যু হল না। লতার বাঁধন ছিঁড়ে একসময় সে

উঠে এল জল থেকে। এর পর পাণ্ডবরা অনেক সাবধান হয়ে গেল।

রাজকুমারদের প্রথম অস্ত্রগুরুর নাম কৃপ। তাঁর বোন কৃপীর স্বামীর নাম দ্রোণ। ইনি ব্রাহ্মণ হয়েও অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করেছিলেন। এঁর কাছেই শিক্ষা পেয়ে কৌরব আর পাণ্ডবরা অসাধারণ বীর হয়ে ওঠে। দ্রোণের ছেলের নাম অশ্বত্থামা। সেও রাজকুমারদের সঙ্গে বড় হয়ে উঠল। সকালবেলা রাজকুমাররা আসবার আগেই দ্রোণ তাঁর ছেলেকে বিশেষ ভাবে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। অর্জুন সে-কথা জানতে পেরে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসত গুরুর বাড়িতে। অর্জুনের এত বেশি আগ্রহ দেখে দ্রোণ তাকে শেখাতেন খুব যত্ন করে। তাঁর ইচ্ছে হল, অর্জুনই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর। তার সমকক্ষ কেউ থাকবে না।

এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

রাজকুমাররা মাঝে-মাঝেই শিকার করতে যায়, সেটাও তাদের শিক্ষার অঙ্গ। দল বেঁধে সবাই যায়, সঙ্গে অনেক কুকুরও থাকে। কুকুরগুলোই বুনো জন্তুদের খুঁজে বের করে। কিছুক্ষণ সবাই মিলে দাপাদাপি করার পর একসময় ওদেরই একটা কুকুর অর্জুন আর কয়েক জনের সামনে এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। তার মুখের মধ্যে সাতখানা ছোট-ছোট তির বেঁধা। তাতে সে মরছে না বটে, কিন্তু কোনও আওয়াজও বের করতে পারছে না। সবাই হতবাক। এ রকম

আশ্চর্য ব্যাপার কেউ কখনও দেখেনি। এ যেন তির চালিয়ে কুকুরটার মুখ সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।

এ রকম ক্ষমতা অর্জুনেরও নেই। কে এই কাণ্ড করেছে, তাকে খুঁজতে বেরোল সকলে। একসময় দেখা গেল, বনের মধ্যে একটা কুঁড়েঘর, সেখানে ধনুক আর বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। সে প্রায় অর্জুনদেরই সমবয়সি, গায়ের রং কুচকুচে কালো। সে কোনও দিকে না তাকিয়ে শুধু শব্দ শুনেই তির ছুড়ছে।

অর্জুন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হে বীর, তুমি কে? কার পুত্র?"

সে ছেলেটি বলল, "আমি নিষাদদের নেতা হিরণ্যধেনুর ছেলে।"

অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী? তুমি কার কাছ থেকে এমন অপূর্ব যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ?"

ছেলেটি বলল, "আমার নাম একলব্য। আমার গুরু দ্রোণ। আমি তাঁর কাছেই সব কিছু শিখেছি।"

এই কথা শুনে রাজকুমারদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। এই ছেলেটি অস্ত্রগুরু দ্রোণের শিষ্য? দ্রোণ কবে একে সব শেখালেন? এ ছেলেটিকে তো আগে ওরা কেউ দেখেনি!

অর্জুনের মনে বেশ দুঃখ হল। দ্রোণ তাকে বলেছিলেন, অর্জুনই হবে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা, কিন্তু এ ছেলেটি তো তার চেয়েও বেশি কিছু জানে।

রাজকুমাররা ফিরে এসে দ্রোণকে সব কথা জানাতে, তিনিও খুব বিস্মিত হলেন। একলব্য? সে আবার কে? এই নামে তো তাঁর কোনও শিষ্য নেই। এই নামটাই তিনি আগে শোনেননি। তিনি রাজকুমারদের বললেন, "চলো তো, চলো তো, আমি নিজে গিয়ে দেখি!"

কয়েক দিনের মধ্যেই আবার সকলে এল সেই জঙ্গলে। সেই কুঁড়েঘরটার সামনে একলব্য একই রকম ভাবে তির ছোড়া অভ্যেস করছে।

দ্রোণকে দেখেই সে অতিব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করল। জল এনে ধুয়ে দিল তাঁর পা। একটা পাথরের উপর হরিণের চামড়া পেতে আসন তৈরি করল দ্রোণের জন্য। তারপর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল হাতজোড় করে।

দ্রোণ বললেন, "ওহে, তুমি তো দেখছি যথার্থ একজন বীর। কিন্তু আমি তো তোমায় কখনও দেখিনি। আমি তোমার গুরু হলাম কী করে?"

একলব্য বলল, "কয়েক বছর আগে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম আপনার শিষ্য হতে। আপনি রাজি হননি। হয়তো আপনার মনে নেই।"

সত্যিই দ্রোণের কিছুই মনে নেই। তিনি বললেন, "আমি তোমায় কিছুই শেখাইনি। তবু তুমি আমায় গুরু বলছ কেন?"

একলব্য বলল, "আপনার চেয়ে বড় গুরু তো আর হয় না। তাই আমি ফিরে এসে মাটি দিয়ে আপনার একটা মূর্তি গড়েছি।"

ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে সে বলল, "এই দেখুন সেই মূর্তি। আমি রোজ এই মূর্তি পুজো করি। তারপর একা-একা অস্ত্রচালনা অভ্যেস করেছি। তাতেই যেটুকু পারি, শিখেছি। আপনি অবশ্যই আমার গুরু।"

দ্রোণের প্রায় স্তম্ভিত হওয়ার মতো অবস্থা। জঙ্গলের মধ্যে একা-একা এই ছেলেটি এত কিছু শিখেছে! কতখানি নিষ্ঠা আর মনের জোর থাকলে এটা সম্ভব। এ রকম আর কখনও শোনা যায়নি।

দ্রোণ রাজকুমারদের মুখের দিকে তাকালেন। অর্জুনের মনের জ্বালা তিনি বুঝতে পারলেন ঠিকই। তিনি নিজেই তো চেয়েছিলেন, অর্জুনের সমান যোদ্ধা আর কেউ হবে না। এ ছেলেটি তো এর মধ্যেই অর্জুনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তিনি বললেন, "ওহে নিষাদ, তুমি যখন আমাকে গুরু বলেই মেনেছ, তখন তো তোমাকে গুরুদক্ষিণাও দিতে হবে।"

একলব্য বলল, "নিশ্চয়ই। সে তো আমার সৌভাগ্য। আমার যা কিছু আছে, যতটুকু আমার সাধ্য, সবই আপনাকে দিতে রাজি আছি। আপনি অনুগ্রহ করে কী চান বলুন।"

দ্রোণ বললেন, "যা চাইব তাই-ই যদি দিতে চাও, তা হলে তোমার

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে আমাকে উপহার দাও।”

দ্রোণের এ রকম নিষ্ঠুর কথা শুনেও এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না একলব্য। সে তক্ষুনি একটা খড়গ এনে ঘ্যাচাং করে কেটে ফেলল তার বুড়ো আঙুল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়াতে লাগল চতুর্দিকে।

দ্রোণ এই অত্যন্ত অন্যায় কাজটি করলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনের জন্য। অর্জুনের আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

যারা জঙ্গলে থাকে, শিকার করাই যাদের পেশা, তাদের বলে নিষাদ। আদিবাসীও বলা হয়। এই একজন নিষাদের ছেলে রাজকুমারদের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে, তা দ্রোণ চাননি বলেই একলব্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে যদি অনেক কিছু শিখতে পারে, সেজন্য তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবু তার উপর এমন অবিচার করলেন দ্রোণ। বুড়ো আঙুল কেটে ফেললে মানুষ আর যুদ্ধ করতে তো পারেই না, কোনও কিছুই শক্ত করে ধরতে পারে না। দ্রোণ অসাধারণ অস্ত্রগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষটা তেমন মহৎ ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে প্রতিফলও পেতে হয়েছিল।

যাই হোক, রাজকুমারদের তো শিক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, এবার লোকজনের সমাজে তাদের কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে হবে। এজন্য দ্রোণ পরপর দু'টি ব্যবস্থা করলেন।

প্রথমে তিনি একজন শিল্পীকে দিয়ে একটা নীল রঙের পাখি তৈরি

করালেন। তারপর সেই পাখিটিকে একটা উঁচু গাছের উপর বসিয়ে সমস্ত রাজকুমারদের ডাকলেন। তাদের বললেন, “তোমরা সবাই তির-ধনুক নিয়ে তৈরি হও। ওই যে পাখিটা দেখছ, ওর মুন্ডু কেটে মাটিতে ফেলতে হবে। একে-একে এসো, আমি বলার পর তির ছুড়বে।”

প্রথমে তিনি ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে।

যুধিষ্ঠির তির-ধনুক উঁচিয়ে তৈরি হতেই দ্রোণ বললেন, “বৎস, তুমি ওই গাছের ডালে পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছ?”

যুধিষ্ঠির বলল, “হ্যাঁ, গুরুদেব।”

দ্রোণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি পাখিটা ছাড়া পুরো গাছটা দেখতে পাচ্ছ?”

যুধিষ্ঠির বলল, “হ্যাঁ, গুরুদেব, আমি সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি।”

দ্রোণ হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, “ধুত, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুমি এখান থেকে সরে পড়ো।”

যুধিষ্ঠির বেচারি ভাল মানুষ। যুদ্ধবিদ্যা তেমন ভাল ভাবে শিখতে পারেনি। কিন্তু তির ছোড়ার আগেই সে কেন এমন ধমক খেল, তা বুঝতেই পারল না।

দ্রোণ এবার ডাকলেন দুর্যোধনকে। তাকেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি নীল পাখিটা দেখতে পাচ্ছ?”

দুর্যোধন বলল, "হ্যাঁ গুরুদেব, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

দ্রোণ আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি পুরো গাছটা, আমাকে, তোমার ভাইদেরও দেখতে পাচ্ছ?"

দুর্যোধন সগর্বে উত্তর দিল, "কেন দেখতে পাব না, সবই দেখতে পাচ্ছি। আমার তো চোখ খারাপ নয়।"

দ্রোণ গম্ভীর ভাবে বললেন, "এই উত্তর আমি শুনতে চাইনি, তুমি সরে যাও।"

এর পর আরও অন্য রাজকুমারদের ডাকা হল। কারও উত্তরই দ্রোণের পছন্দ হল না।

একেবারে শেষে তিনি ডাকলেন অর্জুনকে। অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার পর দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, তুমি কি গাছটি দেখতে পাচ্ছ? গাছের উপর পাখিটাকে? আমাকে আর তোমার ভাইদের?"

অর্জুন বলল, "গুরুদেব, আমি গাছটি দেখতে পাচ্ছি না, আপনাকে আর ভাইদেরও দেখছি না। শুধু পাখিটাকে দেখছি।"

দ্রোণ বললেন, "তুমি গোটা পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছ?"

অর্জুন বলল, "না, আপনি তো বলেছেন ওর মাথাটা কেটে ফেলতে, তাই আমি শুধু ওর মাথাটাই দেখছি।"

দ্রোণ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বেশ, এবার লক্ষ্যভেদ করো।"

তাঁর কথা শেষ হতে না-হতেই অর্জুনের তির ছুটে গেল। সেই নকল পাখিটার মুন্ডু খসে পড়ল মাটিতে।

দারুণ খুশি হয়ে দ্রোণ জড়িয়ে ধরলেন প্রিয়তম শিষ্যকে। কোনও কিছুকে তিরবিদ্ধ করতে গেলে শুধু একাগ্র ভাবে সেটাকেই দেখতে হয়, এ-কথা শুধু অর্জুন বুঝেছে।

এর পর আরও বড় প্রদর্শনী।

যুদ্ধক্ষেত্রের মতো একটা বিশাল জায়গা ঘিরে রাখা হবে। সেখানে সব রাজকুমার একসঙ্গে তাদের অস্ত্রচালনার কৌশল দেখাবে। পরস্পরের সঙ্গে তারা যুদ্ধও করবে। তবে নকল যুদ্ধ, কেউ কাউকে মারবে না।

কয়েক দিন ধরে সাজানো হল সেই যুদ্ধক্ষেত্র। দর্শকদের জন্য একদিকে বসার ব্যবস্থা হল, মেয়েদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট দিনে হাজার-হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হল। রাজধানী হস্তিনাপুরে এই উৎসব দেখতে দূর-দূর থেকেও এল অনেকে।

প্রথমে বাদ্যকরেরা নানারকম বাজনা বাজাতে লাগল। আকাশ-বাতাস ভরে গেল সুরের মূর্ছনায়। তারপর প্রবেশ করলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণ, তাঁর পরনে ধপধপে সাদা পোশাক। মাথার চুল সাদা, দাড়ি সাদা, গলায় সাদা পইতে, গায়ে শ্বেতচন্দন মাখা, গলায় সাদা ফুলের মালা। তারপর এলেন তাঁর শ্যালক কৃপ ও ছেলে অশ্বত্থামা। আরও

কিছু ব্রাহ্মণ এসে মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ করলেন কিছুক্ষণ।

এবার দ্রোণের নির্দেশে সার বেঁধে প্রবেশ করল সুসজ্জিত রাজকুমাররা। গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তারা শুরু করল যুদ্ধখেলা। কতরকম অস্ত্র, সেইসব অস্ত্রের সে কী ঝনঝন রব। যদিও আসল যুদ্ধ নয়, তবু যোদ্ধাদের চিৎকারে কান পাতা দায়।

দর্শকরা মুগ্ধ। সকলকে স্বীকার করতেই হল যে, অসাধারণ দ্রোণের শিক্ষার গুণ। এর পর এই রাজ্য আক্রমণ করতে আর কোনও রাজার সাহস হবে না।

এই খেলার সময় শুধু এক জায়গাতেই এক-আধবার গন্ডগোল হচ্ছে। দুর্যোধন আর ভীম দু'জনেই গদাযুদ্ধে প্রায় সমান-সমান। এই দুই ভাই তো কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। খেলার ছলে লড়তে-লড়তে একসময় দু'জনেই এত রেগে যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে যেন একজন আর একজনকে মেরেই ফেলবে। তখন দ্রোণের নির্দেশে অশ্বত্থামা ছুটে গিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে তাদের। দর্শকরাও দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল মনে করছে দুর্যোধন বড় যোদ্ধা, অন্যদল মনে করছে ভীম।

অর্জুনের খেলা সব শেষে, আর একলা। অর্জুনের সঙ্গে তো লড়বার মতো আর কেউ নেই।

অর্জুন অস্ত্রের যেসব কেরামতি দেখাতে লাগল, তা যেন ভোজবাজির

মতো। কখনও তার তিরের ডগায় আগুন জ্বলে উঠছে, কখনও তার তির মাটি ভেদ করে তুলে আনছে জলের ফোয়ারা। কখনও সে একসঙ্গে এত তির ছুড়ছে যে, মাথার উপর আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কখনও সে রথে চড়ে বাণবিদ্ধ করছে একটা লোহার তৈরি শূকরকে, কখনও সে মেঘ ফুটো করে বৃষ্টি নামাচ্ছে।

অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যা দেখানো শেষ হয়নি। এর মধ্যেই আর একজন যুবক ধীর পায়ে ঢুকল সে যুদ্ধক্ষেত্রে। খুবই সুন্দর তার চেহারা, টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক, ফরসা রং, কোঁকড়ানো চুল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। দুই কানে কবচকুণ্ডল। তাকে দেখলেই মনে হয়, সে সাধারণ কেউ নয়।

তাকে দেখে দর্শকদের চিৎকার থেমে গেল। সকলেরই চোখে কৌতূহল, এ কে? এ কে?

যুবকটি অর্জুনের কাছে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "পার্থ, তুমি অস্ত্র নিয়ে যেসব কীর্তি দেখালে, তা বেশ ভালই হয়েছে। তবে এর প্রত্যেকটি আমিও করে দেখাচ্ছি, তুমি অবাক হোয়ো না।"

তারপর দ্রোণের অনুমতি নিয়ে সেই যুবকটি তির-ধনুক তুলল। অর্জুন এতক্ষণ যেসব কৃতিত্ব দেখাচ্ছিল, তার প্রত্যেকটিই সে ঠিক-ঠিক দেখিয়ে দিল।

সকলে একেবারে তাজ্জব। একটুক্ষণ সকলে চুপ করে রইল।

তারপর কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওকে চিনেছি। ওর নাম তো কর্ণ, কর্ণও মহাবীর।"

শুধু মহাবীর নয়, অর্জুনের সমকক্ষ। এ পর্যন্ত তো সকলে ধরে নিয়েছিল অর্জুনের মতো বীর এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এখন দেখা গেল, এই তো আর একজন আছে!

কর্ণকে দেখে সবচেয়ে খুশি হল দুর্যোধন আর তার ভাইরা। সকলে সবসময় অর্জুনের প্রশংসা করে, তাতে তাদের বুকে জ্বালা ধরায়। ভীম সবসময় তাদের অপমান করে। এখন একে যদি দলে পাওয়া যায়...

দুর্যোধন দৌড়ে গিয়ে কর্ণকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এসো, এসো, তুমি আমাদের কাছে থাকবে। তুমি যা চাইবে তাই-ই পাবে। এর পর ও-ই ওদের উচিত শিক্ষা দেবে। ওদের খুব বাড় বেড়েছিল।"

কর্ণের অস্ত্রের তেজ দেখে অর্জুনের এমনিতে হিংসে হয়েছিল, এখন ওই ধরনের কথা শুনে হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে সে বলল, "ওহে কর্ণ, যাদের কেউ ডাকেনি তবু কথা বলতে আসে, তাদের নরকে যাওয়া উচিত। তোমাকে আমি সেখানে পাঠাব।"

কর্ণ বলল, "ডাকেনি মানে কী? এ জায়গাটা তো সকলের জন্যই খোলা। রাজ্যের যে কেউ এখানে খেলায় যোগ দিতে পারে, তাই আমি এসেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তাতেও আমি

রাজি আছি। তারপর দেখা যাক, কে কাকে নরকে পাঠায়!"

দু'জনে দাঁড়াল মুখোমুখি। এবার আর খেলা নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ হবে। আকাশের মেঘ সরে গেল, সূর্য দেখা গেল কর্ণের ঠিক মাথার উপরে। সবাই উদগ্রীব হয়ে রইল। কে জিতবে, কে হারবে? দর্শকরাও দু' ভাগ হয়ে গিয়েছে।

দ্রোণ চুপ করে গিয়েছেন। এই কর্ণ তো তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেনি, তাই নিষাদ একলব্যের মতো একে কোনও শাস্তিও দিতে পারবেন না। লোকে এ-কথাও জানল যে, দ্রোণের কাছে শিক্ষা না নিয়েও কেউ অর্জুনের সমান বীর হতে পারে!

এই সময় বৃদ্ধ কৃপ দু' জনের মাঝখানে এসে কর্ণকে বললেন, "দ্যাখো, এই অর্জুন হচ্ছে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র আর রানি কুন্তীর সন্তান। তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও। কোন বংশে তোমার জন্ম, তোমার বাবার নাম কী? রাজকুমাররা তো যার-তার সঙ্গে যুদ্ধ করে না।"

এ-কথা শুনে কর্ণ কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল। তার মুখখানা বর্ষার জলে ভেজা পদ্মফুলের মতো রাঙা মনে হল।

সকলেই বুঝে গেল, এই কর্ণ তো রাজকুমার নয়ই, সেরকম কোনও বংশপরিচয়ও নেই তার।

তখন দুর্যোধন এগিয়ে এসে কৃপকে বলল, "আচার্য, এই কর্ণ যে

যুদ্ধ করতে জানে, তার তো প্রমাণ দিয়েছেই। বীরের সঙ্গে বীর যুদ্ধ করবে না কেন? তবু অর্জুন যদি রাজা বা রাজপুত্র ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি না থাকে, তা হলে আমি এই মুহূর্তে তাকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদ দিতে চাই।"

মূল রাজ্য ছাড়াও রাজকুমারদের অধীনে ছোট-ছোট নিজস্ব রাজ্য থাকে। দুর্যোধনেরও ছিল সেরকম অঙ্গরাজ্য। তক্ষুনি হাঁকডাক করে, পুরোহিত আনিয়ে সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ানো হল। তারপর দুর্যোধন কর্ণের মাথায় পরিয়ে দিল রাজমুকুট।

তখন কর্ণ খুবই অভিভূত হয়ে বলল, "রাজকুমার, তুমি যে আমাকে এই সম্মান দিলে, তার বদলে আমি তোমাকে কী দিতে পারি?"

দুর্যোধন বলল, "কর্ণ, আমি আর কিছু চাই না। তোমার বন্ধুত্ব চাই।"

কর্ণ বলল, "আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। আমি কথা দিচ্ছি, সব সময় তোমায় সাহায্য করব, তোমার পাশে-পাশে থাকব।"

এর পর তো যুদ্ধ হতেই পারে! আর কোনও বাধা নেই।

তবু বাধা পড়ল। সেই রঙ্গভূমিতে আর একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করলেন, তিনি ভয়ে কাঁপছেন। ঘামে ভিজে গিয়েছে তাঁর সারা গা।

তাঁকে দেখে কর্ণ ছুটে গিয়ে সেই রাজমুকুট পরা অবস্থাতেই মাথা নুইয়ে, তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সবাই বুঝতে পারল, ইনিই কর্ণের বাবা।

এঁর নাম অধিরথ। ইনি পেশায় রথ চালান অর্থাৎ জাতিতে শূদ্র। তিনি কর্ণকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগল।

এই কর্ণ যে সামান্য এক শূদ্রের সন্তান, তা বুঝতে পেরে ভীম মুখ বিকৃত করে হি হি করে হেসে উঠল, "ওরে নরাধম, তুই অর্জুনের হাতে মরতে চাস? তোর শখ তো কম নয়! যা, যা, তুই রথচালকের ছেলে, তুইও গিয়ে রথ চালা। পুজোর প্রসাদ যেমন কুকুরকে খাওয়ানো যায় না, এই অঙ্গরাজ্যের রাজা হওয়াও তোকে মানাবে না।"

এ-কথা শুনে অপমানে ও রাগে কর্ণের শরীর কাঁপতে লাগল, তবু সে কোনও উত্তর দিল না। বারবার তাকাতে লাগল আকাশের দিকে, দেখল সূর্যকে।

দুর্যোধন বলল, "ভীম, তোমার এ ধরনের কথা বলা একেবারেই উচিত নয়। মানুষের ভাগ্য কতরকম হয়। কতরকম জায়গা থেকে আসে। বীরত্বটাই আসল কথা। এই কর্ণ মহাবীর, অঙ্গরাজ্যও এঁর পক্ষে অতি সামান্য। ইচ্ছে করলে ইনি সারা পৃথিবী জয় করতে পারেন। অত কথার দরকার কী? এঁর সঙ্গে লড়াই করেই দ্যাখো না।"

এর মধ্যে আর একটা কাণ্ড হয়েছে।

রাজকুমারদের এই যুদ্ধখেলা দেখতে রাজবাড়ি থেকে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুন্তী, গান্ধারী ও আরও সবাই এসেছেন। কর্ণকে

নিয়ে যখন অন্যরকম ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ কুন্তী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মাথায় জল দেওয়া ও সেবা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

কুন্তী অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন? তিনি কানের কবচকুণ্ডল দেখে কর্ণকে চিনতে পেরেছেন।

সেই যে বিয়ের আগে এক ঋষির কাছ থেকে বর পেয়ে কুন্তী এক মন্ত্র উচ্চারণ করে সূর্যদেবতাকে ডেকেছিলেন। সূর্যের আশীর্বাদে তাঁর একটি ছেলে জন্মায়। লজ্জায় সে-কথা গোপন করবার জন্য তিনি শিশুটিকে একটা ভেলায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীতে। সে-কথা মনে আছে আমাদের।

সেই শিশু কিন্তু মরেনি। ভেলাটা ভাসতে-ভাসতে একটা ঘাটে এসে ঠেকে। সেখানে রাধা নামে এক মহিলা স্নান করতে এসেছিলেন। ফুটফুটে বাচ্চাটাকে দেখে কোলে তুলে নিয়ে যান। তিনিই আদরযত্নে বাচ্চাটিকে বড় করে তোলেন। এই রাধারই স্বামীর নাম অধিরথ। ছেলেবেলা থেকে কর্ণ এই দু' জনকেই মা-বাবা বলে জানে। নানা জায়গা থেকে অস্ত্রশিক্ষা করে সে এখন মহাবীর হয়ে উঠেছে।

কর্ণকে চিনতে পেরে কুন্তীর বুক কেঁপে উঠেছিল, তবু এবারেও তিনি অন্যদের কর্ণর পরিচয় জানাতে পারলেন না।

অত সব কাণ্ডের মধ্যে সন্ধে হয়ে গেল। সন্ধের পর আর যুদ্ধ করার

নিয়ম নেই। আজ আর কিছু হবে না, এখন সকলের বাড়ি ফেরার পালা।

কর্ণের মতো এক মহাবীরকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে দুর্যোধন আনন্দে লাফাতে-লাফাতে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেল। আর ভয়ে কাঁপতে লাগল যুধিষ্ঠিরের বুক। তার ধারণা হল, এই কর্ণ অর্জুনের চেয়েও বড় বীর। দুর্যোধন এর সাহায্য পেলে অনেক বিপদ ঘটাবে।

যুধিষ্ঠির জানল না যে, ভীম যাকে অত খারাপ কথা বলেছে, সে যাকে অত ভয় পাচ্ছে, সে আসলে তার আপন দাদা। আর কর্ণও জানল না যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এই তিনজনই তার নিজের মায়ের পেটের ভাই।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসিয়ে আসল রাজ্য চালান ভীষ্ম। এখন রাজকুমাররা বড় হয়েছে, তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে রাজপদে বরণ করা উচিত। কাকে?

যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন এই দু'জনেই আসল দাবিদার। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর এইসব গুরুজন এসে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, যুধিষ্ঠিরকেই রাজমুকুট দেওয়া উচিত। যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমান, ধীর, স্থির, সহজেই মানুষের মন জয় করে নিতে পারে। অন্য দিকে দুর্যোধনেরও অনেক যোগ্যতা আছে ঠিকই, তবে সে বড় চঞ্চল আর উদ্ধত। সাধারণ মানুষ তাকে যে ভয় পায়, কিন্তু ভালবাসে না।

যুধিষ্ঠিরের নাম যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হল। যুবরাজই কিছুদিন পরে রাজা হন। দুর্যোধন এই খবর শুনে রাগে, হিংসেয় জ্বলে উঠলেন। কিছুতেই তিনি তাঁর দাবি ছাড়তে চান না। তাঁর বাবা যদি অন্ধ না হতেন, তা হলে তিনি-ই তো রাজা থাকতেন। আর এই বংশের নিয়ম অনুসারে রাজার বড়ছেলে হিসেবে সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য। পাণ্ডু তো কিছুদিনের জন্য রাজা হয়েছিলেন, তাঁর বড় ছেলে রাজত্ব পেতেই পারেন না।

যতই রাগ হোক, দুর্যোধনরা তো তখনই পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করতে পারেন না। গুরুজনরা বাধা দেবেন। দেশের প্রজারাও খেপে যেতে পারে। তখন দুর্যোধন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন, কীভাবে কৌশল করে পাণ্ডবদের বিনাশ করা যায়। বিনাশ মানে একেবারে মেরে ফেলা। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা একটা ষড়যন্ত্র করে ফেললেন। দুর্যোধনদের এক মামার নাম শকুনি। তাঁর খুব কূট বুদ্ধি। এ ছাড়া কনিক নামে এক মন্ত্রী, ভাই দুঃশাসন এঁরাও দুর্যোধনকে উসকে দেন, কর্ণও এই দলে যোগ দিয়েছেন।

এঁরা সবাই মিলে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। যুধিষ্ঠির রাজা হলে পাণ্ডবরাই যে প্রধান হয়ে উঠবেন দিন-দিন, কৌরবরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হবেন, আর কোনও দিনই কৌরব বংশের কেউ রাজা

হতে পারবেন না, এইসব বোঝালেন। এবং বললেন, যে-কোনও উপায়ে হোক, যুধিষ্ঠিরদের সরাতেই হবে।

ধৃতরাষ্ট্র মানুষটা ভাল, কিন্তু দুর্বল। নিজের ছেলেদের প্রতি তাঁর বেশি স্নেহ থাকা স্বাভাবিক। আবার পাণ্ডবদেরও তিনি ভালবাসেন। যুধিষ্ঠির সব সময় তাঁর সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করেন, তাঁকে রাজমুকুট দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজেও রাজি হয়েছেন। অথচ দুর্যোধনের রাগ আর অভিমান দেখে তাঁর কষ্টও হয়। এখন কী করেন তিনি?

দুর্যোধনরা বললেন, "আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। পাণ্ডবদের কাছাকাছি দেখলেই আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা হচ্ছে। আপনি কিছুদিনের জন্য ওদের বহু দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। বারণাবত বলে একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে, ওরা কয়েক মাস সেখানে গিয়ে থাকুক না। ওদের জন্য একটা চমৎকার বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে সেখানে।"

ধৃতরাষ্ট্র প্রস্তাবে রাজি হলেন। তাঁর কথা শুনে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব বেড়াতে গেলেন বারণাবতে। সে স্থানটি অপরূপ সুন্দর। আর তাঁদের জন্য যে বাড়িটি বানানো, সেটি যেমনই বিশাল, তেমনি সুসজ্জিত। রাজমাতা আর রাজকুমাররা তো এখানে বেড়াতে আসতেই পারেন।

কিন্তু দুর্যোধনরা কি বেশি-বেশি খাতির করবার জন্য যুধিষ্ঠিরদের এখানে পাঠিয়েছেন?

আসল ব্যাপারটা হল, দুর্যোধনের সাঙ্গোপাঙ্গরা ওই যে বাড়িটা বানিয়েছেন, তাতে রয়েছে প্রচুর দাহ্য পদার্থ। অর্থাৎ যা সহজেই আগুনে জ্বলে যায়। ওঁদের মতলবটা এই যে, সময়-সুযোগ বুঝে পাণ্ডবরা যে রাত্রে প্রচুর খাওয়াদাওয়া করে অঘোরে ঘুমোবেন, সেই রাতে চুপি-চুপি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। লকলক করে জ্বলে উঠবে আগুন, পাণ্ডবরা পালাবার সুযোগ পাবেন না। সবাই পুড়ে মরবেন সেখানে। এই বাড়িটার নাম জতুগৃহ।

ওঁদের কাকা বিদুর এই ষড়যন্ত্রটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দুর্যোধনের চেয়েও যুধিষ্ঠিরদের বেশি ভালবাসেন। যুধিষ্ঠিররা যখন রাজধানী ছেড়ে চলে আসেন, তখন তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করবার সময় সাংকেতিক ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কথা আর কেউ বোঝেননি, শুধু যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন। যুধিষ্ঠির সেই জন্য বারণাবতে এসেই খুব গোপনে লোক ডাকিয়ে বাড়ির মধ্যে এক জায়গায় গর্ত খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করালেন। তারপর একদিন নিজেরাই সেই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। একটু পরেই সেই আগুন এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল যে, নগরের বহু লোক ছুটে এসেও তা নিভিয়ে ফেলতে পারল না। পুরো বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেল।

সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকেও পাণ্ডবরা বুঝলেন পালাতে হবে তাড়াতাড়ি। দুর্যোধনরা টের পেলে যদি পিছু-পিছু তাড়া করেন? কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে তো দৌড়নো সহজ নয়, কুন্তীর পক্ষে তো খুবই কষ্টকর। ভীম মাকে তুলে নিলেন কাঁধের উপর। নকুল আর সহদেবকে বগলদাবা করলেন, আর যুধিষ্ঠির, অর্জুনকে দু' হাতে ধরে ছুটে চললেন ঝড়ের বেগে। গাছপালা ভেঙে, মাটি কাঁপিয়ে যেতে লাগলেন ভীম।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা উপস্থিত হলেন গঙ্গা নদীর কূলে। সেখানে নদী যেমন চওড়া, তেমনই বড়-বড় ঢেউ। কী করে পার হওয়া যাবে? দূর থেকে একটা নৌকো এগিয়ে এল, সেটা পাঠিয়েছেন বিদুর। সেই নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে পাণ্ডবরা ঢুকে পড়লেন একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে। কৌরবদের কেউ যাতে সন্ধান না পান, তাই ভীম সবাইকে নিয়ে আবার ছুটতে-ছুটতে চলে গেলেন বনের অনেক ভিতরে। সেখানে গাছপালা এত নিবিড় যে, সূর্যের আলো দেখা যায় না। খাওয়ার মতো কোনও ফলমূলও নেই। জলও নেই।

এক জায়গায় সবাই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তৃষ্ণায় আকুল হয়ে পড়লেন কুন্তী। মায়ের এই কষ্ট দেখে ভীম বললেন, "আপনারা এখানে বিশ্রাম নিন, আমি যেমন ভাবে হোক জল নিয়ে আসছি।"

কোথায় আছে জলাশয়? খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে ভীম দেখলেন, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক হাঁস, যাদের বলে
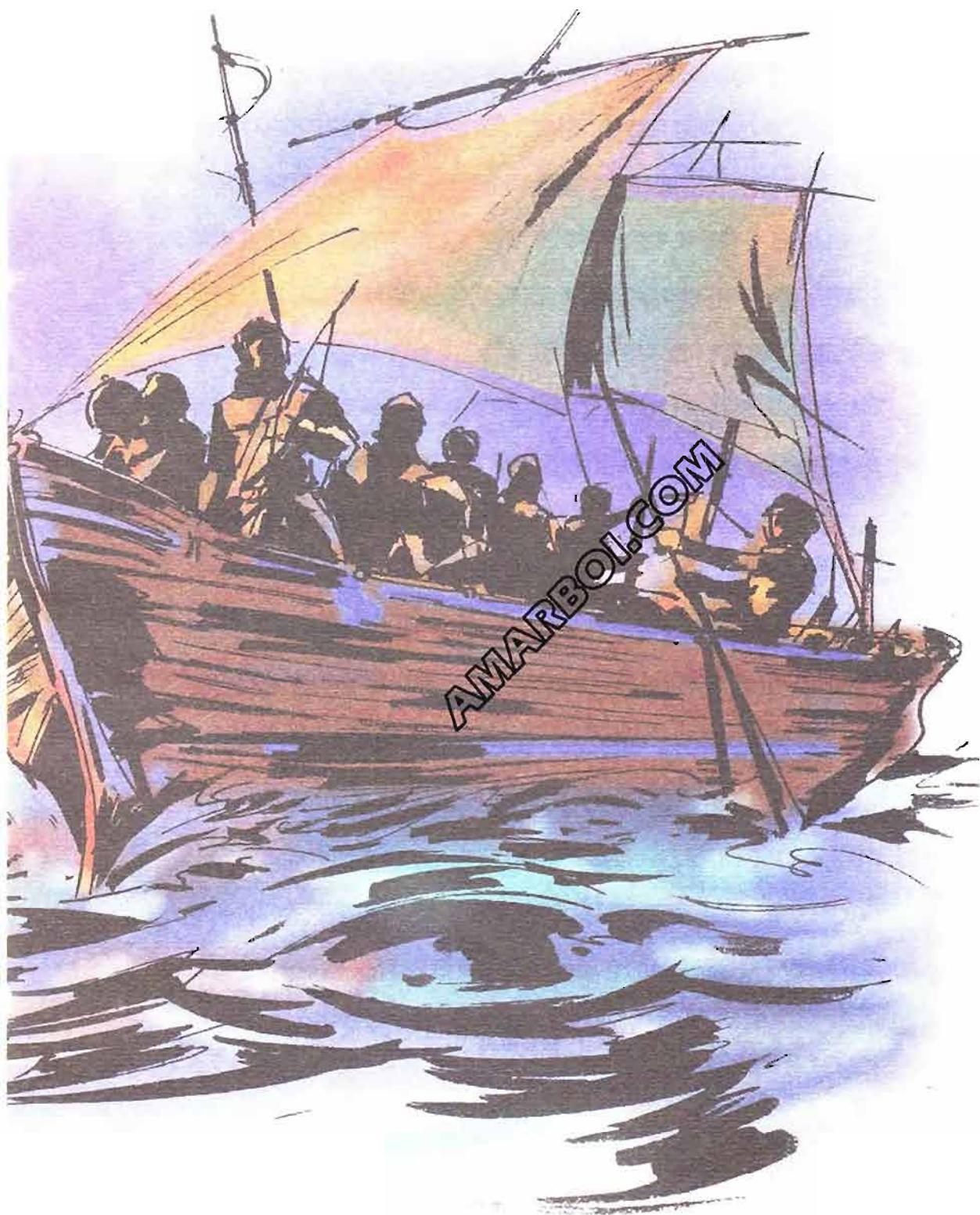
সারস। এরা তো জলেই থাকে। তাই ভীম ওদের দেখে-দেখে ছুটতে লাগলেন, পৌঁছে গেলেন এক সরোবরে। এত পরিশ্রমে ভীমের সারা গা ঘেমে গিয়েছে। তিনি আগে জলে নেমে ভাল করে স্নান করে নিলেন। তারপর কোনও মতে একটা পাত্র তৈরি করে নিয়ে এলেন জল। ফিরে দেখলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর চার ভাই আর মা মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভীমের চোখে জল এসে গেল। তাঁর মা কত বড় বংশের মেয়ে, মহারাজ পাণ্ডুর পত্নী, কত আরামে, কত নরম শয্যায় তাঁর শোয়া অভ্যেস, আজ তাঁর এই অবস্থা! তাঁর ভাইরাও তো রাজকুমার, শুয়ে আছেন মাটিতে।

শুধু যে দুঃখ হল তাই-ই নয়, একটু পরে তাঁর শরীর জ্বলতে লাগল অসম্ভব রাগে। দাদা যুধিষ্ঠির যদি অনুমতি দিতেন, তা হলে পালিয়ে না এসে তিনি দুর্যোধনদের সকলকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

ভীম ওঁদের ঘুম ভাঙালেন না। তিনি একা জেগে বসে পাহারা দিতে লাগলেন। জঙ্গলে তো কতরকম বিপদ হতে পারে!

একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

এ আবার কে? জঙ্গলের মধ্যে একা কে সুন্দরী? কাছে এসে মেয়েটি মিষ্টি গলায় বলল, "আপনি কে? এখানে ঘুমিয়ে আছে কারা? আপনি জানেন না, এই বনে এক সাংঘাতিক হিংস্র রাক্ষস থাকে? সে

নরখাদক, সে আপনাদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে। এদের জাগিয়ে তুলুন, শিগগিরই পালান এখান থেকে।”

ভীম বললেন, “ওসব রাক্ষস-টাক্ষস আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি আস্তে কথা বলো, এঁদের যেন ঘুম না ভাঙে।”

মেয়েটি বলল, “আপনি বুঝতে পারছেন না, সে অতি বিশাল এক রাক্ষস। কেউ তার সঙ্গে পারে না। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব।”

ভীম বুঝতে পারলেন, এ মেয়েটিও রাক্ষসী। ওরা যেমন ইচ্ছে রূপ ধরতে পারে। ভীম বললেন, “আমাদের নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এখান থেকে সরে পড়ো।”

মেয়েটি তবু আন্তরিক আরও কাকুতি-মিনতি করছে, তারই মধ্যে হুমহাম করে এসে পড়ল এক অতিকায় রাক্ষস। তার নাম হিড়িম্ব। আর ওই সুন্দরী সাজা মেয়েটি তারই বোন হিড়িম্বা।

হিড়িম্ব রাক্ষস একটা তালগাছের মতো লম্বা। মুলোর মতো বড় দাঁত, চোখ দু'টো জ্বলছে আগুনের গোলার মতো। সে এসে একবার গর্জন করতেই ভীম তার একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে গেলেন অনেকটা দূরে। যাতে তাঁর মা-ভাইদের ঘুম না ভাঙে।

তারপর দু'জনে শুরু হল লড়াই।

রাক্ষসটি লম্বায়-চওড়ায় ভীমের চেয়ে অনেক বড় হলেও ভীমের গায়েও অসাধারণ শক্তি। দারুণ যুদ্ধ চলতে লাগল দু'জনের মধ্যে।

এর মধ্যে অন্যদের ঘুম ভেঙে গিয়েছে আওয়াজ শুনে। চার ভাই গেলেন ভীমের কাছে।

হিড়িম্ব আর ভীম প্রায় সমান-সমান লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এক-একটা গাছ তুলে মারছেন পরস্পরকে। অর্জুন ভীমকে বললেন, "তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? তা হলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

ভীম বললেন, "না, সাহায্য লাগবে না। এইবার দ্যাখ!"

ভীম সেই হিড়িম্ব রাক্ষসের একটা হাত ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন মাথার উপরে। তারপর প্রচণ্ড জোরে তাকে আছড়ে ফেললেন মাটিতে। ব্যস, সে রাক্ষস আর উঠল না।

এদিকে হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে বসে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে চাইনি। আমার দাদা অতি হিংস্র, কিন্তু আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। আপনার ছেলে ভীম অত বড় বীর, তাকে আমি বিয়ে করতে পারলে ধন্য হব।"

হিড়িম্বকে বধ করে মায়ের কাছে ফিরে এসে ভীম দেখলেন, তখনও হিড়িম্বা বসে আছে।

ভীম বললেন, "রাক্ষসের বোন যতই সুন্দরী সাজুক, এও তো রাক্ষসী। একেই বা আর বাঁচিয়ে রাখা হবে কেন?"

ভীম তাকে মারতে যেতেই যুধিষ্ঠির বললেন, "না-না ভীম, স্ত্রী-হত্যা করতে নেই।"

কুন্তী বললেন, "সত্যিই তো, ও তো কিছু দোষ করেনি। ওকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

ভীম আর হিড়িম্বাকে মারলেন না। মায়ের কথা শুনে তাকে বিয়েই করে ফেললেন। পরে তাঁদের একটি ছেলে হয়েছিল, তার নাম ঘটোৎকচ। এই নামটি মনে রাখতে হবে। আমাদের এই মহাভারতের কাহিনিতে ঘটোৎকচ এক সময় ফিরে আসবে।

জতুগৃহ থেকে পালিয়ে এসে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল বনে-জঙ্গলে। পাণ্ডবরা বুঝতে পারলেন, দুর্যোধন একবার যখন তাঁদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন, এর পরে আবারও নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করবেন। পাণ্ডবরা সংখ্যায় মোটে পাঁচজন। আর দুর্যোধনের একশো ভাই, তা ছাড়াও অনেক সঙ্গীসাথি আর সৈন্যসামন্তও এখন তাঁর অধীনে। সুতরাং এখন সরাসরি যুদ্ধ করা যাবে না। কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

তাঁরা তাঁদের পোশাক বদলে ফেললেন। বড়-বড় গাছের ছাল দিয়ে একরকম পোশাক তৈরি হয়, তাকে বলে বল্কল। মুনি-ঋষিরা এই পোশাক পরেন। কুন্তী আর তাঁর পাঁচটি ছেলে ওই পোশাক পরে

নিলেন ছদ্মবেশ। এখন আর কেউ তাঁদের চিনতে পারবে না।

ঘুরতে-ঘুরতে এক সময় তাঁরা উপস্থিত হলেন একটা নগরে। তার নাম একচক্রা। সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পেলেন। জঙ্গলে তবু হরিণ শিকার আর ফলমূল জোগাড় করে খাবার জুটত। শহরে কী হবে? পাঁচ রাজপুত্র রোজ ভিক্ষে করতে বেরোতে লাগলেন। পাঁচজনই মহাবীর, কিন্তু ব্রাহ্মণ সেজে থাকতে হচ্ছে বলে ভিক্ষে করতেও কোনও লজ্জা নেই।

দিনের শেষে যুধিষ্ঠির ভিক্ষেয় পাওয়া চাল-ডাল-গম সব দিয়ে দেন কুন্তীর কাছে। কুন্তী নিজে রান্না করে খাবারটা দু' ভাগ করে নিয়ে এক ভাগ প্রথমেই রাখেন ভীমের জন্য। আর বাকি এক ভাগকে আবার পাঁচ ভাগ করে নিজেরা খেয়ে নেন। ভীমের বড় চেহারা, তাই তাঁর বেশি খাবার লাগে। সব সময় তাঁর পেটে খিদের আগুন জ্বলে, সেইজন্য তাঁর আর এক নাম বৃকোদর। বৃক মানে আগুন।

আর যেদিন ভিক্ষে করে শুধু ফলটল পাওয়া যায়, রান্নার কিছু নেই, সেদিন মা তাঁর ছেলেদের বলেন, "নিজেরাই ভাগ করে নিয়ে নাও।"

এইভাবে তো কেটে গেল কয়েকদিন।

একদিন কুন্তী শুনতে পেলেন, একটা ঘরে কারা যেন কান্নাকাটি করছে।

তিনি তখন কান পেতে শুনলেন, যে ব্রাহ্মণের এই বাড়ি, তিনি আর তাঁর স্ত্রী আকুল ভাবে কাঁদছেন আর কী যেন বলছেন। ওঁদের এক ছেলে আর এক মেয়ে। সেই মেয়েটাও কাঁদছে আর ছেলেটি খুব বাচ্চা, সে বারবার বলছে, "তোমরা কাঁদছ কেন? ও মা, কী হয়েছে, বলো না?"

তখন কুন্তী তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কাঁদছেন কেন? কিছু বিপদ হয়েছে? আমি কি আমাদের সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

ব্রাহ্মণ তখন বললেন, "আপনি আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন, এতেই আমরা ধন্য হয়েছি। কিন্তু আমাদের যা বিপদ, তাতে সাহায্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এই নগরটা একটা রাক্ষস দখল করে রেখেছে। সে এতই শক্তিশালী যে, তাকে দূর করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সে একটা নিয়ম করেছে যে, প্রতিদিন এক-একটা বাড়ি থেকে একজন মানুষকে পাঠাতে হবে তার কাছে, তাকে সে খাবে। যে পরিবার এই নিয়ম ভাঙবে, সে এসে সেই পরিবার একেবারে ধ্বংস করে দেবে। আজ আমাদের পালা পড়েছে। যেতে একজনকে হবেই। বাবা-মায়ের বদলে আমাদের প্রিয় কন্যাটিই যাবে বলে জেদ ধরেছে।"

সব শুনে কুন্তী বললেন, "আপনারা এজন্য চিন্তা করবেন না।

আপনাদের ছেলেটি খুবই ছোট আর মেয়েটিও বেশি বড় নয়। আপনারা স্বামী-স্ত্রী চলে গেলে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। আমার তো পাঁচটি ছেলে, আমি তাদের একজনকে পাঠাচ্ছি।”

ব্রাহ্মণ অমনই না-না করে উঠে বললেন, “তা হয় না। আপনারা আমাদের অতিথি, আমাদের জন্য আপনাদের এত বড় ক্ষতি...।”

কুন্তী কিছুই শুনলেন না। তিনি ভীমকে পাঠাবেন ঠিক করলেন।

তা শুনে যুধিষ্ঠির খুবই আপত্তি জানালেন। কারণ বিপদে-আপদে ভীমই তাঁদের প্রধান ভরসা।

ভীম কিন্তু মায়ের কথা মেনে নিতে রাজি।

শুধু মানুষ নয়, সঙ্গে বেশ কিছু খাবারদাবারও পাঠাতে হয় রাক্ষসের জন্য। সে থাকে এক পাহাড়ের উপরে। তার নাম বকরাক্ষস।

ভীম সকালবেলা সেখানে উপস্থিত হয়ে রাক্ষসকে দেখতে পেলেন না। দু'-চার বার তার নাম ধরে ডেকেই ভীম সেই সব খাবার নিজেই খেতে শুরু করে দিলেন। একটু পরেই প্রকাণ্ড চেহারার সেই রাক্ষস ভীমকে খাবার খেতে দেখে রেগে গিয়ে হুংকার দিল। ভীম গ্রাহ্যই করলেন না।

রাক্ষস কাছে এসে ভীমের পিঠে চপেটাঘাত করতে লাগল।

তবুও ভীম তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। খাবার শেষ হয়নি যে।

রাক্ষস তখন একটা গাছ উপড়ে এনে ধেয়ে এল ভীমের দিকে।

ভীম তখন খাবারের ঝুড়িটা একেবারে খালি করে ফেলেছেন। বেশ একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আয়, যুদ্ধ করবি?"

এই রাক্ষসটা হিড়িম্ব রাক্ষসের চেয়েও বড়।

এই রাক্ষসরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে জানে না। এরা একটা গাছ তুলে গদার মতো করে নেয় কিংবা খালি হাতেই লড়াই করতে আসে।

ভীমও এক টানে গাছ উপড়ে তুলে ফেলতে পারেন আর তাঁর গায়ের জোরও সাংঘাতিক। কিছুক্ষণ গাছে-গাছে পেটাপিটির পর শুরু হল হাতাহাতি। প্রায় সমানে-সমানে যুদ্ধের পর একবার ভীম বকরাক্ষসকে মাথার উপরে তুলে বনবন করে ঘুরিয়ে দারুণ জোরে আছাড় মারলেন। তাতেই সে শেষ!

বকরাক্ষসের বাড়িতে তার বউ-ছেলেমেয়ে, আরও অনেক লোক থাকে। তারা এই কাণ্ড দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

ভীম তাদের বললেন, "আজ থেকে তোমরা আর মানুষ খাবে না, এই প্রতিজ্ঞা করো। তা হলে আমি তোমাদের কোনও ক্ষতি করব না। নইলে কিন্তু আবার এসে সবাইকে শেষ করে দেব।"

একচক্রা নগরীর সব মানুষ রাক্ষসের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু ভীমের কথা কেউ জানল না। কেটে গেল আরও কিছুদিন। একদিন কুন্তী তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, “দ্যাখ, এই জায়গাটা আর ভাল লাগছে না। একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। লোকে ভিক্ষেও তো কম দিচ্ছে দেখছি। অন্য কোথাও যাবি?”

মাতৃভক্ত ছেলেরা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। বেরিয়ে পড়লেন পরদিনই।

এর মধ্যে কুন্তী এক অতিথি ব্রাহ্মণের কাছে পাঞ্চাল দেশ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলেন। সেইজন্য ঠিক হল, সেখানেই যাওয়া যাক। খুব বেশি দূরেও নয়। হাঁটতে-হাঁটতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন এবং এক কুমোরের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

কয়েক দিন পর ওঁরা দেখলেন, দলে-দলে মানুষ পথ দিয়ে চলেছে একই দিকে। কোথায় যাচ্ছে এরা? একজন পথিকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কথা হল। জানা গেল যে, সেই দেশের রাজকন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছে। বহু দেশ থেকে বহু মানুষ আসছে, বিরাট উৎসব হবে। ব্রাহ্মণদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজা।

পাণ্ডবভাইরা তো ব্রাহ্মণ সেজেই আছেন। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁরাও যাবেন সেই উৎসব দেখতে।

এর মধ্যেই জানা গিয়েছে যে, সেই রাজকন্যার নাম দ্রৌপদী। তাঁর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন। এঁদের জন্ম সাধারণ ভাবে হয়নি। এঁরা দু'জনেই অলৌকিক ভাবে উঠে এসেছেন যজ্ঞের আগুন থেকে। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর

এবং দ্রৌপদীর মতো রূপসি আর ভূ-ভারতে নেই।

উৎসব আসরটি দারুণ জমকালো ভাবে সাজানো। সব দিকে ফুলের সুগন্ধ। এক পাশে বসেছেন বহু রাজা ও রাজকুমার, অন্য পাশে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ঋষি, আর এক পাশে এ দেশের মহারাজ ও বিশিষ্টজনেরা। এত সব রাজা-রাজড়ার মধ্যে কার গলায় বরমাল্য দেবেন দ্রৌপদী? সেই জন্য একটা অস্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ধনুক ও কয়েকটা বাণ রাখা আছে, আর অনেক উপরে রয়েছে এক গোল যন্ত্র, তারও উপরে একটা জিনিস। যিনি ওই ধনুকে ছিলা পরিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে ওই যন্ত্রের গোল ফুটোর মধ্যে দিয়ে জিনিসকে বিদ্ধ করে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারবেন, তাঁকেই বরণ করবেন দ্রৌপদী।

যে জিনিসটা বিদ্ধ করতে হবে, সেটা কী? মহাভারতে তা লেখা নেই। গল্প বলার সময় সৌতি ভুলে গিয়েছেন। পরে অনেকে বানিয়েছেন যে, ওটা ছিল হিরে-মুক্তোয় তৈরি একটা নকল মাছ। হতেও পারে।

বেশ কিছুক্ষণ নাচ-গান হওয়ার পর এল সেই শুভক্ষণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর বোনকে সঙ্গে করে এনে সমবেত রাজন্যবর্গকে শুনিয়ে দিলেন দ্রৌপদীকে জয় করার শর্ত। তারপর এক-এক করে বলতে লাগলেন রাজাদের নাম আর পরিচয়। সে তালিকা শেষই হতে চায় না।

এই রাজাদের মধ্যে রয়েছেন দুর্যোধন ও তার অনেক ভাই, কর্ণ

ও অন্য বীরেরা এবং বলরাম, তাঁর ভাই কৃষ্ণ ও যদু বংশের আরও অনেকে। আমাদের গল্পে কৃষ্ণ-বলরামকে আগে দেখিনি। কুন্তী কৃষ্ণ-বলরামদের পিসি হন, সেই সম্পর্কে পাণ্ডবরা এঁদের পিসতুতো ভাই। কিন্তু এতদিন ওঁদের দেখা হয়নি।

যতটা শোনা গিয়েছিল, দ্রৌপদী যেন তার চেয়েও বেশি সুন্দর। ঠিক যেন আগুনের শিখা।

এর পর শুরু হল পরীক্ষা। এ পরীক্ষা যে কত কঠিন, তা আগে বোঝা যায়নি। বড়-বড় রাজারা এই বিশাল ধনুকে গুণ পরাতেই পারলেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। অনেকের জামাকাপড় ছিঁড়ে গেল। মনে হল, কেউই এটা পারবেন না।

তখন উঠে দাঁড়ালেন কর্ণ।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকা পাণ্ডবরা তাঁকে চিনতে পেরেই ভাবলেন, ইনি ঠিকই পারবেন। অন্য অনেক রাজাও ভাবলেন, ইনি লাভ করবেন কন্যারত্নটি।

কর্ণ এসে অনায়াসে সে ধনুকে জ্যা পরিয়ে তির হাতে নিলেন।

দ্রৌপদী তখন বলে উঠলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।"

অপমানে, রাগে কর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার সূর্যকে দেখলেন। তারপর ফিরে গেলেন মুখ নিচু করে।

আর কেউ পারছেন না দেখে উঠে এলেন অর্জুন। ঠিক কর্ণেরই মতো তিনি ধনুকে জ্যা পরালেন অনায়াসে । তারপর পাঁচটি বাণে যন্ত্র ভেদ করে সেই জিনিসটি নামিয়ে আনলেন নীচে। দ্রৌপদী মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়।

তারপর মহাকোলাহল শুরু হয়ে গেল। একদল বললেন, "স্বয়ংবর সভায় শুধু ক্ষত্রিয়রাই অংশ নিতে পারে। এই বামুনের তো কোনও অধিকার নেই। এত সব রাজাকে ডেকে এনে অপমান করা হয়েছে।"

আর একদল বললেন, "ব্রাহ্মণেরা সব পারে। সব কিছুতেই তাদের অধিকার আছে।"

ক্ষত্রিয়ের দল তেড়ে এলেন অর্জুনদের দিকে। এ রাজ্যও তাঁরা ধ্বংস করে দিতে চান। এত রাজা একসঙ্গে, তাঁদের বিরুদ্ধে কে লড়াই করবে?

ভীম তুলে আনলেন একটা বড় গাছ, অর্জুন হাতে নিলেন তির-ধনুক, দুই ভাই অন্যদের আড়াল করে দাঁড়ালেন। অর্জুন বললেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন, কী হয়।"

এই দুই ভাইয়ের বীরত্বের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। একে-একে সবাই কুপোকাত হতে লাগলেন। আর কর্ণ? তাঁর মতো এত বড় বীরও হেরে গেলেন? কর্ণও প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন।

একসময় অর্জুনের একেবারে কাছে এসে পড়ে বললেন, "হে দ্বিজ, তুমি সত্যিকারের কে? তোমার তিরচালনা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি স্বয়ং রাম কিংবা সূর্য কিংবা সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু।"

অর্জুন বললেন, "না-না, আমি রাম-টামের মতো অত বড় কেউ নই। আমি এক ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছি। আসুন যুদ্ধ করি।"

কর্ণ বললেন, "না, আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ করি না।"

তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন। এঁরা পরস্পর দুই ভাই, কিন্তু কেউ কাউকে চিনলেন না।

কৃষ্ণ তাঁর দাদাকে বললেন, "ওই যে দু'জন যুদ্ধ করছে, ওরা নিশ্চয়ই ভীম আর অর্জুন। এ রকম বীর আর কে হবে? শুনেছিলাম বটে, জতুগৃহে ওরা পুড়ে মরেনি!"

কৃষ্ণ তখন সকলের মাঝখানে এসে বললেন, "আপনারা থামুন, থামুন। এই ব্যক্তিই সব নিয়ম মেনে, ধর্ম অনুসারে শর্ত পূরণ করে রাজকুমারীকে লাভ করেছেন। তাতে আপনারা আপত্তি করছেন কেন?"

কৃষ্ণের কথায় থামল যুদ্ধ। রাজারা ফিরে যেতে লাগলেন। নববধূকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ ভাই চললেন মাকে সুসংবাদ জানাতে।

বাড়িতে পৌঁছে ভীম আর অর্জুন মজা করে বললেন, "মা দ্যাখো, আজ ভিক্ষে করে কী এনেছি।"

কিছু একটা জিনিস ভেবে কুন্তী ঘরের ভিতর থেকে বললেন, “যা এনেছ, তোমরা পাঁচজনে ভাগ করে নাও।”

তারপরই মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তিনি যেমন লজ্জা পেলেন, তেমন ধর্মভয়ও হল। এ কী বললেন তিনি? তারপরই তিনি ছেলেদের বললেন, “যা বলে ফেলেছি, বলেছি। এখন তোমরা যে-কোনও একজন ভাই এই মেয়েটিকে বিয়ে করো। যুধিষ্ঠির সবচেয়ে বড়...।”

যুধিষ্ঠির, এমনকী অর্জুন, পাঁচ ভাইয়ের কেউই দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না। তাঁরা কোনওদিন মায়ের কোনও কথা অমান্য করেননি, মাতৃবাক্য কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

তা হলে কী হবে? দ্রৌপদীকে ফেরত দিয়ে আসাও রীতিবিরুদ্ধ।

সে রাতে আর কিছু মীমাংসা হল না। যা সামান্য খাবার ছিল, তাই খেয়ে শুয়ে পড়লেন সবাই। খাট-বিছানা তো নেই। ভূমিশয্যায় শয়ন। দ্রৌপদীও শুয়ে পড়লেন কুন্তীর পায়ের কাছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন চুপিচুপি এসে দেখে গিয়েছিলেন, এই ব্রাহ্মণেরা কোথায় থাকেন। রাজাকে সেই খবর দিতে রাজা তাঁর দূত এবং রথ পাঠিয়ে সকলকে নিয়ে এলেন রাজবাড়িতে। স্বয়ংবর সভার পর তো ধুমধাম করে বিয়ের উৎসব করতে হবে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ডেকে কবে অর্জুনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হবে, তা জানতে চাইলেন।

তখন যুধিষ্ঠিরকে বলতেই হল নিদারুণ সংবাদটি, “মা বলেছেন,

পাঁচজনকে ভাগ করে নিতে। তা হলে পাঁচ ভাইকেই একসঙ্গে বিয়ে করতে হবে এই রাজকন্যাকে। অর্জুন একা বিয়ে করতে রাজি নয়।”

এ-কথা শুনে রাজা দ্রুপদের বুকে যেন বজ্রাঘাত হল। এ কী অসম্ভব কথা! এক পুরুষের অনেক বউ থাকতে পারে, কিন্তু এক নারীর তো একাধিক স্বামী থাকতে পারে না। এ নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেল।

এর মধ্যে এসে পড়লেন মহাঋষি বেদব্যাস। এই কাহিনিতে মাঝে-মাঝেই তাঁকে দেখা যাবে। এটা বেশ মজার ব্যাপার, তিনি মহাভারত লিখেছেন, আবার তিনিই অন্যতম প্রধান চরিত্র।

বেদব্যাস সব শুনে বললেন, “এক নারীর একাধিক স্বামী সাধারণত হয় না বটে, তবে আগে দু’-একবার এ রকম হয়েছে। এখনও হতে পারে, তাতে দোষ নেই।”

এত বড় ঋষির কথা কে অমান্য করবে! তা ছাড়া তিনি যখন বিধান দিয়েছেন, তা হলে নিশ্চয়ই অধর্ম হবে না।

মন্ত্র পড়ে, পাঁচবার পাঁচ রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দ্রৌপদীর।

এদিকে হয়েছে কী, এতদিন পাণ্ডবরা জীবিত না মৃত, তা-ই জানত না অনেকে। এখন সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। তাতে আবার বুকে জ্বালা ধরে গেল দুর্যোধনের। পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন তো বটেই, দ্রৌপদীকেও তাঁরা জয় করে নিয়েছেন। চতুর্দিকে তাঁদের সুনাম। এখন

কি তাঁরা ফিরে এসে রাজ্য চাইবেন? কিছুতেই তাঁদের রাজ্য দেওয়া হবে না। যেমন ভাবে হোক, ওঁদের মেরে ফেলতেই হবে। আগে মারতে হবে ভীমকে। তিনি না থাকলেই দুর্বল হয়ে যাবেন পাণ্ডবরা।

কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুররা এসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন, "দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধির কথা মোটেই শোনা উচিত নয়। বরং পাণ্ডবদের এখন ফিরিয়ে আনা উচিত। রাজ্য দু' ভাগ করে তাঁদের এক ভাগ দিয়ে দিলেই তো হয়। তাতে ঝগড়া মিটে যায়।"

ধৃতরাষ্ট্র এই উপদেশ মেনে নিয়ে বিদুরকে বললেন, "তুমি যাও, ওদের সমাদর করে নিয়ে এসো।"

পাণ্ডবরা ফিরে আসার পর সারা রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। পথের দু' পাশে দাঁড়িয়ে হাজার-হাজার মানুষ অভ্যর্থনা জানাল তাঁদের। পাণ্ডবরাও রাজসভায় এসে প্রণাম করলেন গুরুজনদের।

বিশ্রাম-টিশ্রাম নেওয়ার পর তাঁদের আবার ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বৎস কৌন্তেয়, (কুন্তীর ছেলে বলেই এই নাম) তোমরা এই রাজ্যের অর্ধেক নাও, আর খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে রাজত্ব করো। তা হলে আর দুর্যোধনের সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া হবে না। তোমরা শান্তিতে থাকো।"

জ্যাঠামশাইয়ের এই কথা শুনে খুশিই হলেন পাণ্ডবরা। ধৃতরাষ্ট্রের পা ছুঁয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন এবং অরণ্য পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন

খাণ্ডবপ্রস্থে। সেখানকার প্রধান নগরীর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। সেটাই হল পাণ্ডবদের রাজধানী।

ইন্দ্রপ্রস্থ নগর এমনিতেই বেশ সুন্দর, পাণ্ডবরা সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তুললেন। যুধিষ্ঠির এখন আর রাজকুমার নন, তিনি এখন রাজা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল তাঁর সুনাম। সমস্ত রকম মানুষের সঙ্গেই তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, আর ভুলেও একটাও মিথ্যে বলেন না। চার ভাই তাঁর খুব অনুগত। আর দ্রৌপদী সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন।

এর মধ্যে অর্জুন একবার বেরোলেন ভ্রমণে। অনেক অরণ্য, অনেক রাজ্য ঘুরতে-ঘুরতে তিনি এসে পৌঁছলেন প্রভাসে। সেখানে দেখা হল কৃষ্ণর সঙ্গে। কৃষ্ণ অর্জুনকে নানারকম খাতির-যত্ন ও আপ্যায়ন করলেন। সেখানেই দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুকে নিয়ে গেলেন রৈবতক পাহাড়ে। সেখানে দিনের পর-দিন নানারকম গল্প ও গানবাজনা শুনে চমৎকার সময় কাটতে লাগল। তারপর তাঁরা এলেন দ্বারকায়। এখানে বলরাম ও আরও অনেকে উৎসবে মেতেছিলেন, অর্জুনরাও যোগ দিলেন তাতে। এখানেও নাচ-গান হল খুব।

কিছুদিন পর কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার সঙ্গে বিয়ে হল অর্জুনের। এবার তো নিজের রাজ্যে ফিরতে হবে। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রা ছাড়াও কৃষ্ণ-বলরাম ও আরও অনেকে চলে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। যুধিষ্ঠির সকলকে

অভ্যর্থনা করলেন আন্তরিক ভাবে। সুভদ্রাকে দেখে দ্রৌপদী প্রথমে একটু রাগ করলেন বটে অর্জুনের উপর, তারপর নিজের বোনের মতন মেনে নিলেন।

যুদ্ধবিগ্রহ কিছু নেই, এখন প্রতিদিনই উৎসব। আনন্দ আর ফুর্তি। বলরামের এসব খুবই পছন্দ। তবে বলরামকে একসময় সদলবলে ফিরে যেতে হল, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। দ্রৌপদীর সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব।

একদিন অর্জুন তাঁর বন্ধুকে বললেন, "ক'দিন ধরে কী সাংঘাতিক গরম পড়েছে দেখেছ? যমুনার ধারে একটা সুন্দর জায়গা আছে, এখন সেখানে বেড়াতে গেলে কী হয়?"

কৃষ্ণ বললেন, "আমিও তো সে-কথাই ভাবছিলাম।"

পরদিনই প্রচুর খাদ্য-পানীয় নিয়ে যাত্রা করা হল যমুনা তীরে। সুভদ্রা আর দ্রৌপদী ছাড়াও আরও অনেক নারী-পুরুষ গেলেন সঙ্গে। সেখানে যাঁর যা খুশি তেমন আনন্দে মেতে উঠলেন। গুরুজনরা কেউ নেই, তাই মেয়েদেরও যে-কোনও খাদ্য-পানীয় নিতে বাধা নেই। কেউ জঙ্গলের মধ্যে, কেউ নদীতে নেমে মাতামাতি করতে লাগলেন, কৃষ্ণ আর অর্জুনও উপভোগ করতে লাগলেন সব কিছু।

একসময় এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত। তাঁর মাথায় জটা, মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ।

তাঁকে দেখেই কৃষ্ণ আর অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন।

সেই ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার সব সময় খিদে পায়, আমি অনেক কিছু খাই, তোমরা আমার খাবারের ব্যবস্থা করো।"

ওঁরা দু'জন বললেন, "আপনি কী খেতে চান, বলুন। আমরা নিশ্চয়ই তা জোগাড় করব। যে-কোনও খাদ্য।"

সেই ব্রাহ্মণ আসলে কোনও মুনি বা ঋষি নন। আগুনের একজন দেবতা আছেন, তাঁর নাম অগ্নিদেব, ইনি সেই দেবতা। সব পুজো কিংবা যজ্ঞেই প্রচুর ঘি দেওয়া হয়, অত ঘি খেতে-খেতে অগ্নির অরুচি রোগ হয়েছে, যাকে বলে অগ্নিমান্দ্য। সেই অসুখ সারাবার জন্য তিনি খাণ্ডব নামে গোটা বনটা খেয়ে ফেলতে চান। সেই জঙ্গলের সব গাছপালা, পশুপাখি খেলে তাঁর পেট আবার ঠিক হবে।

কৃষ্ণ আর অর্জুন প্রথমে অবাক হলেন। অগ্নি একটা জঙ্গল খেতে চান, তার জন্য অন্যের সাহায্যের কী দরকার। আগুন তো ইচ্ছে করলেই যে-কোনও জঙ্গল কিংবা নগর পুড়িয়ে দিতে পারে!

অগ্নি বললেন, "এই জঙ্গলে নাগদের এক রাজা তক্ষক তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। তিনি আবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের বন্ধু। সেইজন্যেই অগ্নি এই জঙ্গলে গেলেই ইন্দ্র এমন বৃষ্টি ঢালতে শুরু করেন, তখন অগ্নির আর কোনও তেজ থাকে না। সুতরাং ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ না করে খাণ্ডববনের কিছু ক্ষতি করা যাবে না।"

অর্জুন খুব বড় বীর ঠিকই, কিন্তু ইন্দ্র তো দেবতা। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সোজা কথা? অর্জুন এবং কৃষ্ণ তবু রাজি হলেন। তাঁরা অগ্নিদেবকে বললেন, "আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে রাজি আছি, কিন্তু আমাদের সেরকম অস্ত্র তো নেই।"

অগ্নি তখন অর্জুনকে দিলেন গাণ্ডিব নামে ধনুক আর একটা তূণীর, যেটার নাম অক্ষয় তূণীর অর্থাৎ যার তির কখনও ফুরোয় না এবং পেলেন দারুণ একটা রথ। আর কৃষ্ণ পেলেন সুদর্শন চক্র। এই চক্রটার এমনই ক্ষমতা যে, নিমেষের মধ্যে শত্রুকে বধ করে আবার ফিরে আসবে কৃষ্ণেরই কাছে।

এইসব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিদেবকে বললেন, "এবার আপনি শুরু করুন। আমরা আপনার পার্শ্বরক্ষা করছি।"

শুরু হল খাণ্ডবদাহন। অত বড় একটা বন, বহুরকম গাছ ও পশুপাখি থাকে সেখানে। হঠাৎ আগুন লাগায় দারুণ ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল পশুপাখিরা। অর্জুন আর কৃষ্ণ তির চালিয়ে তাদের ফেরত দিতে লাগলেন আগুনের দিকে, সেখানে তারা মরতে লাগল দলে-দলে।

স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র খাণ্ডববনে অগ্নিকাণ্ডের খবর জেনে তাঁর বন্ধু তক্ষককে বাঁচাবার জন্য বর্ষণ শুরু করে দিলেন। দাউ দাউ করে

জ্বলছে আগুন, আর উপর থেকে পড়ছে বৃষ্টি, তার ফলে সমস্ত অঞ্চল ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে শত-শত জীবজন্তুর আর্ত চিৎকার।

এরই মধ্যে কৃষ্ণ আর অর্জুন তির ছুড়ে-ছুড়ে মেঘ সরিয়ে দিতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে মেঘ। কিন্তু এই সব মেঘ থেকে বর্ষণেও আগুনের তেজ একটুও কমছে না।

তখন ইন্দ্রও কৃষ্ণ আর অর্জুনের উপর নানারকম সাংঘাতিক অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। অন্য আরও অনেক দেবতাও অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।

চলতে লাগল আকাশের দেবতা আর পৃথিবীর দু'টি মাত্র মানুষের সাংঘাতিক যুদ্ধ। অবশ্য কৃষ্ণকে পরে অনেকে স্বয়ং ভগবান বলে মেনে নিয়ে পুজো করে। কিন্তু সেই সময় তো তিনি এসব কিছু নন। মানুষ।

কয়েক দিন ধরে ঘোর যুদ্ধ চলল। ইন্দ্র ও দেবতারা সমান ভাবে অস্ত্রবর্ষণ ও জলবর্ষণ করে যেতে লাগলেন। আর কৃষ্ণ আর অর্জুনের সহায়তায় আগুনও নিভল না, অরণ্যও দগ্ধ হতে লাগল।

তারপর একসময় দৈববাণী হল। তখনকার দিনে মাঝে-মাঝে দৈববাণী হত। কে বলতেন, তাঁকে দেখা যেত না। সেই দৈববাণীতে

বলা হল, “হে দেবরাজ, এই যুদ্ধ বন্ধ করো! কৃষ্ণ আর অর্জুনের এমনই পরাক্রম যে, ওদের কেউ কখনও হারাতে পারবে না, আর তোমরাও পরাজিত হবে না। তা হলে এই যুদ্ধ কতদিন চলবে? হে ইন্দ্র, তোমার বন্ধু তক্ষক এই বনে এখন নেই, অন্য কোথাও গিয়েছেন, সুতরাং তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি।”

এ-কথা শুনে ইন্দ্র অস্ত্র সংবরণ করলেন, দেবতারাও ফিরে গেলেন।

টানা পনেরো দিন ধরে চলল এই অগ্নিকাণ্ড। শুধু তক্ষকের ছেলে অশ্বসেন কোনওক্রমে পালিয়ে যেতে পেরেছিল, আর ময় নামে এক নিরীহ দৈত্য আর চারটি পাখির ছানা বেঁচে গেল।

অত বিশাল খাণ্ডববন ধ্বংস হয়ে গেল একেবারে।

গাছ আমাদের নীরব বন্ধু। কৃষ্ণ আর অর্জুন কেন ওইসব গাছ পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করলেন? সেই জঙ্গলের কত প্রাণী কী বীভৎস ভাবে পুড়ে মরল! অগ্নির বদহজম হয়েছে বলে বড় একটা জঙ্গলকে খেয়ে ফেলতে হবে? কৃষ্ণ আর অর্জুন রাজি হলেন কি অগ্নিদেবতার অভিশাপের ভয়ে? নাকি ওঁর কাছ থেকে ভাল-ভাল অস্ত্র পাওয়া যাবে এই আশায়? গল্পের এই জায়গাটা আমার মতো অনেকেরই পছন্দ হয় না।

॥ ৫ ॥

এখন পাণ্ডবদের একটা নিজস্ব রাজ্য হয়েছে। শত্রু কেউ নেই। তাঁরা নতুন রাজধানী নানা ভাবে সাজাচ্ছেন।

একদিন ময় এসে দেখা করলেন অর্জুনদের সঙ্গে। অর্জুনের পাশে বসে আছেন কৃষ্ণ। ময় তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বললেন, "হে অর্জুন, খাণ্ডববন ধ্বংস করার সময় আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সেই উপকারের বিনিময়ে আমিও আপনাদের কিছু উপকার করতে চাই।"

অর্জুন হেসে বললেন, "উপকারের বদলে কারও কাছ থেকে উপকার নিতে নেই। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি যা বললেন তাই-ই যথেষ্ট।"

ময় তবু বারবার একই অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, সুতরাং তার বিনিময়ে কিছু না দিতে পারলে তাঁর শান্তি হচ্ছে না।
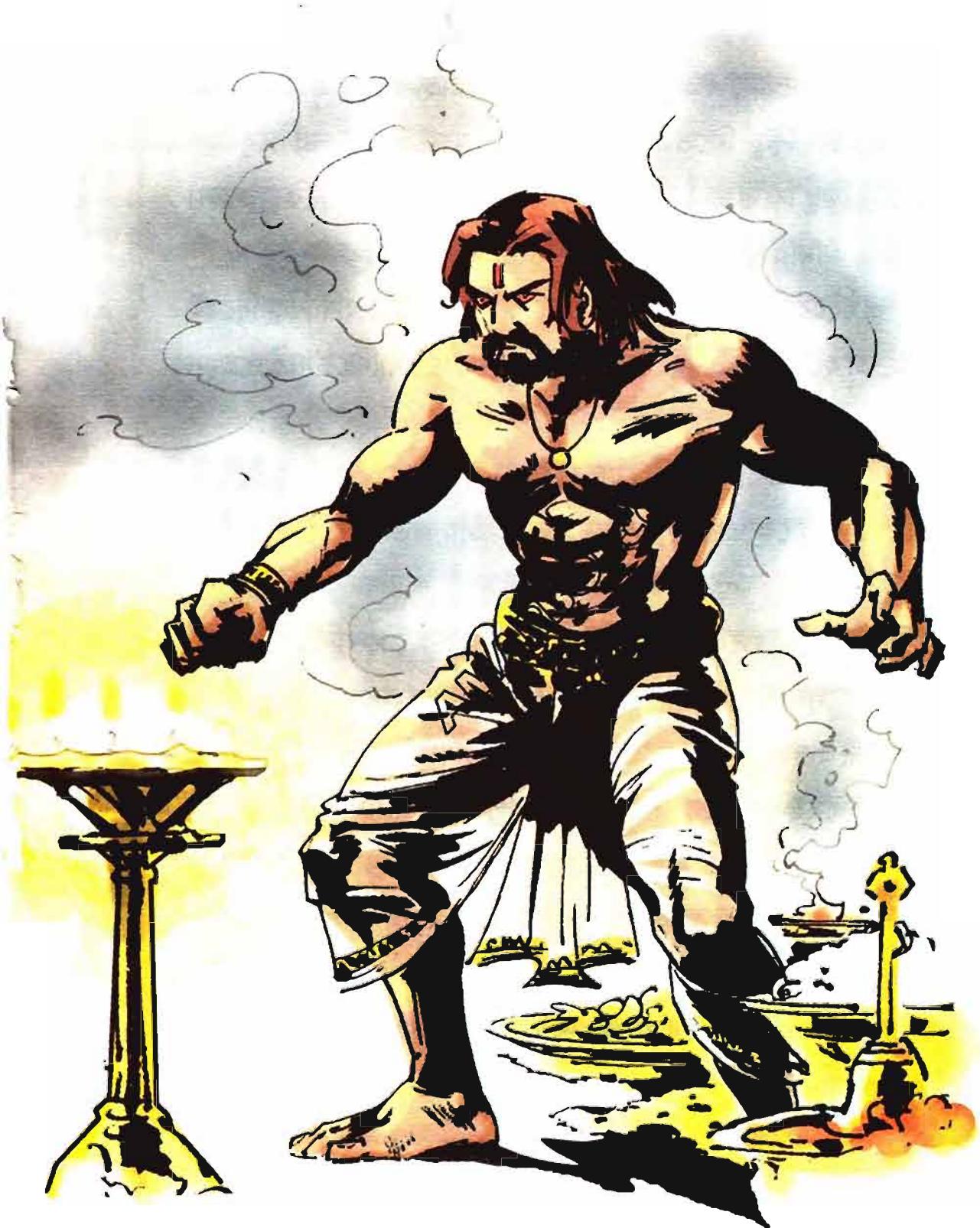
অর্জুন বললেন, "আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি বলেই যে আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে হবে, তা আমি মোটেই চাই না। তবু যদি আপনি কিছু দিতে চান, তা হলে কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য কিছু করুন। তাতেই আমার তৃপ্তি হবে।"

কৃষ্ণ ময়ের কথা শুনে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যদি কিছু দিতেই চাও, তা হলে যুধিষ্ঠিরের রাজসভাটা এমন ভাবে সাজিয়ে দাও, যেমন আগে কোথাও হয়নি।"

দেবতাদের প্রধান স্থপতি যেমন বিশ্বকর্মা, দৈত্যদেরও প্রধান স্থপতি এই ময়। লোকে তাঁকে বলে ময় দানব। তাঁর স্বভাব বেশ শান্ত আর খুবই গুণী।

কৃষ্ণের কথা শুনে ময় চলে গেলেন নিজের দেশে। কিছুদিন পর ফিরে এলেন প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে। তারপর সাজাতে লাগলেন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা। কত রকম মণিমাণিক্য ও স্ফটিক দিয়ে গড়া হল সেই রাজসভা আর তার সঙ্গে পুকুর ও বাগান। উদ্‌বোধনের দিন সেই রাজসভা দেখে সকলেরই চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। এ রকম আগে কেউ কখনও দেখেনি। অতি উজ্জ্বল, অতি মনোহর। মাঝখানের সরোবরটি দেখে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার সামনের চাতাল ও সিঁড়ি স্ফটিকের তৈরি, মনে হয়, সেখানেই বুঝি জল আছে। আর সরোবরের জল এতই স্বচ্ছ যে, জল

বলে মনেই হয় না। কোনও-কোনও রাজা তার উপর দিয়েই হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে। ইনি স্বর্গেও থাকেন, আবার পৃথিবীতেও ঘুরে বেড়ান। এই রাজসভা দেখে তিনিও খুবই মুগ্ধ। তিনি আরও অনেক বিখ্যাত রাজসভা দেখেছেন। যেমন, ইন্দ্রের রাজসভা। দেবতাদের রাজার সভা, সে তো দারুণ হবে নিশ্চয়ই। তারপর যমের সভা, কুবেরের সভা, এমনকী স্বয়ং ব্রহ্মার নিজস্ব সভা, এগুলো খুবই বিখ্যাত বটে, যুধিষ্ঠিরের সভারও তুলনা নেই।

নারদ আরও একটি খবর জানালেন। তিনি বললেন, "মহারাজ ইন্দ্রের সভায় তোমার পিতা পাণ্ডুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁর একটা অনুরোধ তোমাদের জানাতে বলেছেন। তিনি বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের ভাইরা দাদার খুব অনুগত, সেই ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠির ইচ্ছে করলে এখন সারা পৃথিবী জয় করতে পারে। যুধিষ্ঠির এখন রাজসূয় যজ্ঞ করছে না কেন? সেই যজ্ঞ করলে আমি খুব তৃপ্তি পাব।'"

নারদ তো এই কথাটা যুধিষ্ঠিরের কানে তুলে দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ করা কী চাট্টিখানি কথা! অতি বিশাল ব্যাপার। রাজসভায় ঋষিদের ও অন্য ভাইদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবাই মহাউৎসাহে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, হোক-হোক, রাজসূয় যজ্ঞ হোক।"

একটি রাজ্যের অধিপতিকে বলে রাজা। যিনি অনেক রাজ্য জয় করেন তিনি সম্রাট। আর রাজসূয় যজ্ঞ করতে গেলে পৃথিবীর সব রাজাকে জয় করতে হয়। তা কি সম্ভব!

পরামর্শ করার জন্য যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে খবর পাঠালেন। কৃষ্ণ এসে সব শুনে প্রথমেই অন্যদের মতো সায় দিলেন না। সুবিধে-অসুবিধে বিবেচনা করতে লাগলেন। পৃথিবীর কোন রাজার কতটা শক্তি তা তিনি সবই জানেন। সেই সব রাজার পরিচয় দিতে-দিতে কৃষ্ণ বললেন, "ভীম আর অর্জুন এঁদের সবাইকে জয় করতে পারেন, শুধু একজনকে ছাড়া। তাঁর নাম জরাসন্ধ। এই জরাসন্ধকে জয় করার ক্ষমতা পাণ্ডবদেরও নেই। এমনকী, স্বয়ং কৃষ্ণ এবং যাদবরাও এই জরাসন্ধকে আটকাতে না পেরে এখন রৈবতক পাহাড়ের উপর একটা দুর্গ বানিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।"

তা হলে কী উপায়? একজন রাজাও বাকি থাকলে তো রাজসূয় যজ্ঞ হয় না! কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আপনার অবশ্যই রাজসূয় যজ্ঞ করা উচিত। আমি ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে ছদ্মবেশে বেরোচ্ছি। তারপর দেখা যাক কী হয়।"

এই জরাসন্ধ সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। মোটেই সত্যি নয়, তবে গল্পটা বেশ মজার।

মগধের রাজা ছিলেন বৃহদ্রথ। তাঁর দুই রানির কোনও ছেলে ছিল

না। তাই মনে খুব দুঃখ। একদিন শুনলেন, চণ্ডকৌশিক নামে এক নামী ঋষি তাঁর রাজ্যে এসে বসে তপস্যা করছেন। অমনি রাজা তাঁর বউদের সঙ্গে নিয়ে ঋষির পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। রাজার দুঃখের কথা শুনে ঋষি একটুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, একটু পরেই একটা পাকা আম তাঁর কোলে এসে পড়ল। ঋষি একটুক্ষণ সেই আমটি ধরে রাখলেন, তারপর রাজাকে দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে যান, আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।"

ফিরে এসে রাজা তাঁর দুই রানিকে আমটা দিলেন, তাঁরাও সেটি সমান দু'ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিলেন। যথা সময়ে দুই রানিই সন্তানের জন্ম দিলেন। আধখানা ছেলে, এক-একজনের একটা কান, একটা হাত, একটা পা। তারপর কী আর করা যাবে, সেই দুই খণ্ড রাজকুমারের দেহ ফেলে দিয়ে আসা হল আঁস্তাকুড়ে।

রাত্তিরবেলা জরা নামের এক রাক্ষসী মাংসের লোভে রাজধানীতে ঘুরে বেড়ায়। সে ওই দু' টুকরো বাচ্চাকে দেখে হাতে তুলে নিল, তারপর খেলাচ্ছলে জুড়ে দিল টুকরো দু'টো। অমনি বাচ্চাটা জীবন্ত হয়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল। রাক্ষসীর একবার ইচ্ছে হল শিশুটিকে খেয়ে ফেলতে। তারপরেই তার মায়া হল, "আহা কী সুন্দর ছেলে, রাজাকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।"

সে তখন এক সুন্দরী তরুণীর রূপ ধরে বাচ্চাটিকে নিয়ে রাজসভায়

গিয়ে বলল, "রাজা, এই নিন আপনার সন্তান।"

তখন রাজপুরীতে আবার আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

গল্পটা বড়ই আজগুবি আমরা জানি। আধখানা আম থেকে কখনও আধখানা ছেলে জন্মাতে পারে না। আর জরা রাক্ষসী দু'টো টুকরো জোড়া দিতেই বাচ্চাটা বেঁচে উঠল। এই জোড়া দেওয়ার কথাটা আগে রাজবাড়িতে কারও মনে পড়েনি। যাই হোক গল্প তো গল্পই।

জরা রাক্ষসী প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল জরাসন্ধ। ক্রমে-ক্রমে সে হয়ে উঠল এক প্রবল শক্তিমান বীর যোদ্ধা। তাঁর দাপটে সবাই ভয় পায়। একের পর এক রাজ্য জয় করে জরাসন্ধ সেই রাজাদের ধরে এনে নিজের কারাগারে বন্দি করে রাখেন। দেবতার পুজোয় তাঁদের এক-এক করে বলি দেওয়ার ভয় দেখান।

জরাসন্ধকে জয় না করতে পারলে রাজসূয় যজ্ঞ হবে না। আর সম্মুখ যুদ্ধেও জরাসন্ধকে জয় করা সম্ভব নয়, কৌশল করে তাঁকে হারাতে হবে। কৃষ্ণের কথা শুনে ভীম আর অর্জুন ব্রাহ্মণ সেজে যাত্রা করলেন মগধের দিকে। অনেক নদী-পর্বত পেরিয়ে যেতে হল তাঁদের।

সেখানে পৌঁছে কৃষ্ণের নির্দেশে তাঁরা যা কাণ্ড শুরু করলেন, তা মোটেই ব্রাহ্মণদের মানায় না। এটা ভাঙছেন, সেটা ভাঙছেন, হুংকার দিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন। মগধের মানুষ সরে গিয়ে তাঁদের পথ করে দিল।

এইভাবেই দৌড়তে-দৌড়তে রাজবাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে তিন জন উপস্থিত হলেন জরাসন্ধের পুজোর ঘরে।

ব্রাহ্মণবেশে সেই তিন জনকে দেখে জরাসন্ধ পরম ভক্তিভরে তাঁদের পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পুজো করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে?"

কৃষ্ণ শিখিয়ে দিয়েছিলেন বলে ভীম আর অর্জুন কোনও কথা বললেন না। কৃষ্ণ বললেন, "এঁরা ব্রত করেছেন, এখন কথা বলবেন না।"

জরাসন্ধ বললেন, "আপনাদের গলায় মালা, গায়ে চন্দন চিহ্ন। আপনাদের কাপড়ের রং লাল, হাতে যে দাগ রয়েছে, তাতে মনে হয়, আপনাদের ধনুর্বাণ চালনার অভ্যেস আছে। আপনারা কি সত্যিই ব্রাহ্মণ? আপনারা পিছনের দরজা দিয়েই বা ঢুকলেন কেন?"

কৃষ্ণ বললেন, "স্নান উৎসবের সময় ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরাও এ রকম সাজ নিতে পারে। আর শত্রুগৃহে যে-কোনও ভাবে ঢোকা যায়।"

জরাসন্ধ অবাক হয়ে বললেন, "শত্রু! আমি আপনাদের শত্রু হলাম কী করে?"

কৃষ্ণ বললেন, "তুমি অনেক রাজাকে বন্দি করে এনে কারাগারে রেখেছ, তাদের বলি দিতে চাও। এই অন্যায়ের জন্য তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি।"

জরাসন্ধ বললেন, "অন্যায়? আমি তো প্রত্যেকটি রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করে এনেছি। পরাজিত রাজাদের নিয়ে তো যা খুশি করা যায়।"

কৃষ্ণ বললেন, "অত কথার দরকার কী? তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তিন জনের মধ্যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জরাসন্ধ ভীমকেই পছন্দ করলেন।

তারপর শুরু হল বাহুযুদ্ধ।

ভীমের পরাক্রম কে না জানে। আর জরাসন্ধও অতুলনীয় যোদ্ধা। লড়াই হতে লাগল সমানে-সমানে। একসময় দু'জনের গা থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। দু'জনের গর্জনে কেঁপে উঠল সব দিক।

কার্তিক মাসের পয়লা তারিখে আরম্ভ হল সেই যুদ্ধ, চলল টানা তেরো দিন। এর মধ্যে কেউ কিছু খাওয়ারও সময় পায়নি। অবিশ্বাস্য লাগে শুনতে, তাই না? চোদ্দো দিনের দিন জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইলেন। সামনা সামনি যুদ্ধে এক জন বিশ্রাম নিতে চাইলে অন্যজনেরও থেমে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু কৃষ্ণ ভীমকে বললেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে।

ক্লান্ত জরাসন্ধকে অকস্মাৎ তুলে নিয়ে ভীম বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন প্রায় একশো বার। জরাসন্ধর তখন আর বাধা দেওয়ার

ক্ষমতা নেই। ভীম তাঁকে মাটিতে ফেলে পিঠে হাঁটু দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে, তাঁর দু'টো পা ধরে টানতেই তাঁর শরীর দু' ভাগ হয়ে গেল। তাতেই জরাসন্ধ শেষ। তখন ভীমের ভয়ংকর চিৎকারে মনে হল বুঝি হিমালয় কিংবা পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছে।

কারাগার থেকে বন্দি রাজাদের মুক্তি দিতে তাঁরা দু' হাত তুলে বন্দনা করতে লাগলেন কৃষ্ণ আর পাণ্ডবদের। বিজয়গর্বে সেই তিন জন ফিরে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

ব্যস, এর পর আর রাজসূয় যজ্ঞে কোনও বাধা রইল না। তবু পৃথিবীর অন্য সব রাজাদেরও তো বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে। যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠত্ব কেউ না মানতে চাইলে যুদ্ধ করতে হবে তাঁর সঙ্গে। তাই অর্জুন, ভীম, সহদেব আর নকুল এই চার ভাই চারদিকে যাত্রা করলেন দিগ্বিজয়ে।

কয়েক জায়গায় ছোটখাটো যুদ্ধ হল বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের পরাক্রম কেউ সহ্য করতে পারলেন না। ভীম যুদ্ধ করতে-করতে একসময় পৌঁছে গেলেন আমাদের এই বঙ্গদেশে। কিন্তু তখন বঙ্গদেশ ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত। কোনও রাজারই সাধ্য হল না ভীমকে প্রতিহত করার।

চার ভাই-ই ফিরে এলেন প্রচুর ধনরত্ন আর ঘোড়া আর হাতি নিয়ে। এ সবই পরাজিত রাজাদের উপহার। যজ্ঞ করলেও তো প্রচুর খরচ হবে।

যজ্ঞের আয়োজন মানে কী? সে এক এলাহি ব্যাপার। নানান দেশ থেকে বিখ্যাত সব ঋষি, পণ্ডিত আর রাজাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। হস্তিনাপুর থেকেও আসবেন ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, বিদুর, দুর্যোধন ও আরও অনেকে। এঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা থাকার ব্যবস্থা, পছন্দমতো খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। পান থেকে একটু চুন খসলেই নিন্দে হয়ে যাবে। তৈরি হতে লাগল শত-শত নতুন বাড়ি। নতুন রান্নাঘর, আর জোগাড় হল নানা রাজ্যের রান্নার লোক। কোনও ব্যবস্থার ত্রুটি নেই।

তা হলে কি রাজসূয় যজ্ঞ সহজে মিটে গেল? মোটেই না। মোটেই না। একটু-আধটু রক্তপাত হবে না?

সেই পুণ্যদিনে শত-শত রাজা ও বিশিষ্ট মানুষেরা সমবেত হয়েছেন যজ্ঞস্থলে। এ যেন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো উজ্জ্বল। যজ্ঞ শুরুর আগে, একজন কাউকে প্রধান হিসেবে অর্ঘ্য দিতে হয়। কাকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে? ভীষ্মের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যুধিষ্ঠির ঘোষণা করলেন, "এই যজ্ঞের প্রধান হিসেবে অর্ঘ্য দেওয়া হবে কৃষ্ণকে।"

এতে অনেকে অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু চেদি রাজ্যের রাজা শিশুপাল দারুণ রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, "হে যুধিষ্ঠির, তুমি এটা কী করলে? এ কি ছেলেমানুষি নাকি? এই সভায় এত সব জ্ঞানী, গুণী, প্রাজ্ঞ পুরুষ থাকতে তুমি কৃষ্ণকে

পুজো দিলে? কৃষ্ণ কে? সে তো রাজাই নয়। ভীষ্ম যদি তোমাকে এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে, অনেক বয়স হয়েছে তো, তাই ভীষ্মের মতিভ্রম হয়েছে। আরে ভীষ্ম নিজেই তো পুজো পাওয়ার যোগ্য। কিংবা স্বয়ং ঋষি বেদব্যাস এখানে রয়েছেন, কিংবা অস্ত্রগুরু দ্রোণ বা কৃপ। আরও অনেক রাজা এবং মহাবীর কর্ণ, যিনি সমস্ত রাজাদের জয় করেছেন। এঁদের বদলে কৃষ্ণ? তুমি কি আমাদের এখানে ডেকে এনে অপমান করতে চাও?"

কৃষ্ণ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

শিশুপাল কিন্তু থামলেন না। আরও কড়া-কড়া ভাষায় ভীম আর কৃষ্ণের নিন্দে করে যেতে লাগলেন। তা সহ্য করা কঠিন। একবার সহদেব আর একবার ভীম উঠে শিশুপালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ভীষ্ম তাঁদের থামালেন।

খুব ঘাবড়ে গেলেন যুধিষ্ঠির। তা হলে কি সব কিছু ভন্ডুল হয়ে যাবে? অন্য রাজারাও তো কেউ শিশুপালকে থামাবার চেষ্টা করছেন না। কৃষ্ণই বা নীরব কেন?

ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কুকুর কখনও সিংহের সামনে গিয়ে স্পর্ধা দেখাতে পারে? দ্যাখোই না এর পর কী হয়? কৃষ্ণের উপর ভরসা রাখো।"

একটু পরে যা অবস্থা দাঁড়াল, তাতে মনে হচ্ছে সত্যিই হয়তো এত

বড় যজ্ঞের আয়োজন ভন্ডুল হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ ধরে গালমন্দ করেও কৃষ্ণকে উত্তেজিত করা যাচ্ছে না দেখে শিশুপাল এখানে যুদ্ধ করতে চাইলেন কৃষ্ণের সঙ্গে। আরও বেশ কয়েকজন রাজাও দাঁড়ালেন তাঁর পাশে, সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সেজেগুজে প্রস্তুত হল। এই বুঝি যজ্ঞস্থল হয়ে যায় রণক্ষেত্র।

এবার শিশুপাল হেঁকে বললেন, "ওহে জনার্দন (কৃষ্ণের আর-এক নাম), আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। আজ তোমাকে আমি যমালয়ে পাঠাব।"

এবার কৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সব রাজাদের উদ্দেশ করে বললেন, "আপনারা শুনলেন এই দুর্মতি এতক্ষণ ধরে আমার নামে কত মন্দ কথা বলল? এই শিশুপাল আমার এক পিসির ছেলে। অল্পবয়স থেকেই সে অনেক কুকর্ম করেছে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করারও চেষ্টা করেছে। আমাদের রাজ্যে গিয়েও উৎপাত করেছে কয়েক বার। পিসি আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন ওর একশো অপরাধ ক্ষমা করি। আজ সেই একশোতম অপরাধটি ঘটে গেল। ও আমার সঙ্গে যদি যুদ্ধ করতে চায়, তা হলে ওর সেই যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দেওয়া যাক।"

এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণ তাঁর চক্র দিয়ে শিশুপালের মাথাটি কেটে দিলেন। যে লোক লড়াই করার জন্য এত তর্জন-গর্জন

করছিলেন, তিনি কৃষ্ণের একটি চক্রও সামলাতে পারলেন না।

সমস্ত রাজা একেবারে হতবাক। অনেকেই কৃষ্ণের এই তেজস্বী রূপ আগে দেখেননি। কেউ-কেউ অবশ্য কৃষ্ণকে পছন্দ করেন না। কিন্তু মুখে আর কিছু বলার সাহস পেলেন না।

এর পর যজ্ঞ পরিচালনায় কোনও বিঘ্ন ঘটল না।

এই পুরো উৎসবে সবচেয়ে অসুখী মানুষটি কে? অবশ্যই রাজা দুর্যোধন! এখানে এত জাঁকজমক, কত দেশ থেকে রাজারা এসে বারবার জয়ধ্বনি দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের নামে। দুর্যোধনকে কেউ একবারও পাত্তাও দেননি। আর কী দারুণ রাজসভা বানিয়েছেন পাণ্ডবরা! হস্তিনাপুরের পুরনো রাজসভা এর তুলনায় একেবারে ম্লান।

ঘুরে-ঘুরে সবকিছু দেখতে গিয়ে নাকালও হলেন দুর্যোধন। সম্পূর্ণ স্ফটিকের তৈরি প্রাঙ্গণ দেখে তাঁর মনে হল জলাশয়। তিনি পোশাক সামলাতে গেলেন। আবার সত্যিকারের সরোবরের কাছে গিয়ে ভাবলেন, এটাও নিশ্চয়ই স্ফটিকের তৈরি! তার উপর হাঁটতে গিয়ে তিনি সব পোশাক ভিজিয়ে ফেললেন। পিছন থেকে হাসাহাসি করতে লাগলেন পাণ্ডবরা।

পাণ্ডবদের উপর হিংসায় তাঁর শরীর জ্বলছে, তার উপর এই অপমান! তিনি ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে।

দুর্যোধনদের এক মামা আছেন, তাঁর নাম শকুনি। যেমন বুদ্ধি, তেমনই বাকপটু। তিনি দুর্যোধনকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার?"

দুর্যোধন মাথা নামিয়ে বললেন, "মামা, পাণ্ডবদের এত গৌরব আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। তাদের এখন অতুল ঐশ্বর্য আর দারুণ প্রতাপ। তারা যা খুশি করতে পারে, আর আমরা যেন কিছুই না। এই অবস্থা দেখে আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি আগুনে পুড়ে কিংবা বিষ খেয়ে কিংবা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করব।"

শকুনি বললেন, "দুর্যোধন, তুমি শুধু শুধু মাথা গরম করছ কেন? তুমি আগেও কয়েক বার নানাভাবে যুধিষ্ঠিরদের বিনাশ করতে চেয়েছিলে, পারোনি। এখন তুমি তাদের এই রাজ্যের খানিকটা অংশ দিতে বাধ্য হয়েছ। তারা সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে নিজেদের অনেক উন্নতি করেছে, এতে তোমার ঈর্ষার কী কারণ থাকতে পারে? তোমারও তো রাজত্ব আছে, তোমার অনেক সুহৃদ আছেন। তুমি এবার আরও রাজ্য জয় করে তোমার ধনদৌলত বাড়াতে পারো।"

দুর্যোধন বললেন, "পাণ্ডবদের আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ওদের শেষ করতে না পারলে আমার শান্তি হবে না। কালই আমি যুদ্ধযাত্রা করে ওদের রাজ্য-রাজধানী ধ্বংস করে দিতে চাই।"

শকুনি বললেন, "এরকম ছেলেমানুষি কোরো না। তোমার পক্ষেও

অনেক বড়-বড় বীর আছেন বটে, কিন্তু ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, দ্রুপদ রাজার ছেলেরা, ওদের পরাজিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভীম-অর্জুন দৈব অস্ত্র পেয়েছে শুনেছি। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে তুমিই বরং বিপদে পড়বে। এই ইচ্ছা ছাড়ো।"

দুর্যোধন বললেন, "তা হলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি পাণ্ডবদের কাছে কিছুতেই মাথা নিচু করতে পারব না।"

এবার শকুনি বললেন, "যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ করার একটাই উপায় আছে।"

অমনি উৎসাহিত হয়ে দুর্যোধন বললেন, "উপায় আছে? বলুন কী উপায়?"

শকুনি বললেন, "যুধিষ্ঠিরের অনেক গুণ থাকলেও একটি অতি সাংঘাতিক দোষ আছে। ওর খুব পাশার জুয়া খেলার নেশা। কেউ ওকে ডাকলে না বলে না। তা হলে ডাকো যুধিষ্ঠিরকে। তোমার হয়ে আমি খেলব। আর পাশাখেলায় আমিই তো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ। একবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে খেলতে বসলে আমি ওর ধনসম্পদ সব কিছু গ্রাস করে নেব।"

কিন্তু তক্ষুনি তো পাশা খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আগে ধৃতরাষ্ট্রের মত নিতে হবে। দুর্যোধন বাবাকে এই প্রস্তাব জানাতেই,

ধৃতরাষ্ট্র বুঝে গেলেন এর উদ্দেশ্য কী! তিনি বললেন, "পুত্র, যুধিষ্ঠিররাও তো তোমার ভাই। তাদের উপর এত হিংসা করছ কেন? তারা তাদের মতো থাক না। তুমিও তো রাজা, তোমারও ক্ষমতা কিংবা ধনসম্পদ কম নয়। ইচ্ছে করলে তুমি অন্য একটা যজ্ঞ করতে পারো। তাতেও অনেক ধুমধাম হবে। ওসব পাশা খেলাটেলার চিন্তা বাদ দাও।"

কিন্তু দুর্যোধন তা শুনে নিবৃত্ত হলেন না। পাণ্ডবদের এত খ্যাতি, প্রতিপত্তি তাঁর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। যে-কোনও উপায়ে ওঁদের শেষ করতেই হবে, নইলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় অনেকটা গ্রীষ্মকালের নদীর মতো। উপরের জল গরম, তলার দিকে ঠান্ডা, এক্কেবারে দু'রকম। এক-এক সময় তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, তাঁর ছেলে কী-কী অন্যায় করছে, পাণ্ডবদের প্রতি কত অবিচার হচ্ছে, কৌরব বংশের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি ছেলেকে বকুনি দেন, তার অন্যায় আবদারে প্রশ্রয় দেন না। আবার এক-এক সময় তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে দুর্যোধনের অন্যায় আবদারেও রাজি হয়ে যান।

দুর্যোধন অনেকক্ষণ কাকুতি-মিনতি করতেই ধৃতরাষ্ট্র একসময় বললেন, "আচ্ছা, তা হলে সব ব্যবস্থা করো।"

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার নেশা, কিন্তু খেলাটা তিনি ভাল জানেন

না। তাঁর আবার একটা নীতি আছে, কেউ এই খেলায় তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি কিছুতেই তা প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কৌরব পক্ষের আমন্ত্রণ পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাই ও অন্যান্য দলবল নিয়ে চলে এলেন হস্তিনাপুরে।

এই খেলা উপলক্ষে নতুন একটা মণ্ডপ বানিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সেটা সাজানো হয়েছে। দুই পক্ষ বসবেন মুখোমুখি, তার চারপাশ ঘিরে বসবেন দর্শকরা।

যুধিষ্ঠির আসন গ্রহণ করার পর দুর্যোধন বললেন, তাঁর বদলে খেলবেন তাঁর মামা শকুনি, তিনি সব বাজি ধরবেন।

যুধিষ্ঠির এতেও রাজি হয়ে গেলেন।

॥ ৬ ॥

এইবার আমাদের কাহিনিতে সাংঘাতিক সব কাণ্ড শুরু হবে।

সবই এই পাশা খেলাকে কেন্দ্র করে। শুদ্ধ বাংলায় একে বলে দ্যূতক্রীড়া। এই খেলাটা ছিল কেমন, তা আমরা এখন জানি না। একটা মাত্র ঘুঁটি। একবার দান ফেললেই জয়-পরাজয় বোঝা যায়।

এই খেলায় অনেক টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি বাজি ধরতে হয়। প্রথমবার যুধিষ্ঠির বললেন, তাঁর গলার সোনার হারে একটা বহুমূল্য মণি আছে, যেটা সমুদ্র থেকে পাওয়া, সেটাই বাজি। দুর্যোধনও অনেক মণিমাণিক্য ও স্বর্ণমুদ্রা বাজি ধরলেন। একবার দান ফেলেই জিতে গেলেন শকুনি।

যুধিষ্ঠির বুঝে গেলেন, শকুনি কিন্তু একটা জোচ্চুরি করেছেন। সেটা বুঝেও তিনি আবার খেলতে গেলেন কেন?

যুধিষ্ঠির আবার খেলতে রাজি হলেন, কারণ, তিনি ভাবলেন, পরের বার ঠিক জিতবেন। জুয়া খেলায় এ রকমই হয়।

এরপর বারবার প্রচুর ধনরত্ন, ঘোড়া, রথ, এক লক্ষ দাস-দাসী এইসব পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির, প্রত্যেকবার হারলেন। রাজধানী, রাজ্য সব গেল। একেবারে সর্বস্বান্ত!

যুধিষ্ঠিরের পাশে তাঁর চার ভাই বসে আছেন। দাদার উপর তাঁদের এমনই প্রবল ভক্তি যে, একবারও আপত্তির টুঁ শব্দও করেননি কেউ। এখনকার দিনে এটা আমাদের বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়। আমাদের দাদাকে আমরা যতই ভক্তি করি আর ভালবাসি, তবু এ রকম সাংঘাতিক ভুল করতে দেখলে কি একবারও সাবধান করে দেব না?

যুধিষ্ঠিরের তখনও খেলার নেশা যায়নি। কিছুদিন আগেই তিনি ছিলেন বিরাট এক রাজ্যের রাজা, এখন পথের ভিখারি। শকুনি ঠাট্টা করে বললেন, "এবার আর কী বাজি রাখবেন?

জুয়ার নেশায় উন্মত্ত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "আমার ভাই নকুল আমার খুব প্রিয়। তাকেই বাজি রাখলাম।"

এবারেও শকুনি জিতলেন। পরের বার সহদেবকেও তাই।

দুই ভাই ক্রীতদাস হয়ে গেল। শকুনি বললেন, "এরা তো আপনার সৎভাই। আপনার মায়ের পেটের ভাইদের বোধ হয় বাজি রাখবেন না!"

যুধিষ্ঠির রেগে গিয়ে বললেন, "মূর্খ, সব ভাই-ই আমার কাছে

সমান। তুমি এই বলে আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারবে না।”

শকুনি বললেন, “রাজা, জুয়া খেলার সময় অন্য পক্ষকে রাগাবার জন্য তো এ রকম কথা বলাই হয়। এবার তা হলে?”

যুধিষ্ঠির বললেন, “যিনি পণের অযোগ্য, সেই মহাবীর অর্জুনকেই আমি পণ রাখছি।”

এক দানেই জিতে গেলেন শকুনি।

যুধিষ্ঠির বললেন, “আমাদের বিপদে-আপদে সব সময় যার উপর বেশি ভরসা করি, সেই ভীমকে বাজি রাখছি।”

এবারও হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির নিজেকেই বাজি রাখলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে হারলেন।

কাছাকাছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিদুর প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছেন। ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পান না বলে সকলে তাঁকে শোনাচ্ছেন সব কিছু।

এ কী সাংঘাতিক খেলা, রাজ্যহারা পঞ্চপাণ্ডবই এখন কৌরবদের ক্রীতদাস!

এতেও শেষ নয়, শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, “রাজা, আপনার নিজের কিছু ধনসম্পদ বাকি থাকতেই আপনি নিজেকে পণ ধরেছেন, এটা তো ঠিক নয়।”

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, “বাকি আছে? কিছুই তো বাকি নেই।”

শকুনি বললেন, "কেন, দ্রৌপদী? তাকে পণ রেখে যদি জেতেন। তা হলে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "রূপে-গুণে যাঁর তুলনা নেই, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখলাম।"

এবারেও যুধিষ্ঠির জিততে পারলেন না।

সভার একদিকে যেমন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়ল, অন্যদিকে দুর্যোধন আর তার বন্ধুরা আনন্দে খলখল করে হেসে উঠলেন।

দুর্যোধন প্রতিকামী নামে একজন অনুচরকে বললেন, "যাও, তুমি দ্রৌপদীকে এই সভায় ডেকে নিয়ে এসো।"

প্রতিকামীর মুখে সব শুনে দ্রৌপদী বললেন, "তুমি আগে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে এসো যে, তিনি কি আগে আমাকে পণ করেছেন, না নিজে হেরে যাবার পর?"

প্রতিকামী ফিরে এলে যুধিষ্ঠির কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে বসে রইলেন।

দুর্যোধন প্রতিকামীকে বললেন, "তুমি আবার যাও, দ্রৌপদীকে বলো, সে নিজে এসে যেন সভায় এই প্রশ্ন করে।"

প্রতিকামী আবার যেতেই দ্রৌপদী বললেন, "যুধিষ্ঠির উত্তর না দিলেও ওখানে তো ভীষ্ম, দ্রোণের মতো গুরুজনরা রয়েছেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করো, যুধিষ্ঠির নিজে হেরে যাবার পর আমাকে পণ রাখতে পারেন কি না।"

দুর্যোধনের আর এত কচকচি সহ্য হচ্ছে না। ধৈর্য হারিয়ে দুঃশাসন ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে দ্রৌপদীকে টানতে-টানতে নিয়ে এলেন সেই সভায়।

কী বীভৎস কাণ্ড! পাণ্ডবদের রানি, তাঁকে কি অন্তঃপুর থেকে এইভাবে সভায় আনা যায়? অনেকে লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল।

আর দুর্যোধনের দল হইহই করে বলতে লাগলেন, "রানি কোথায়? জুয়ায় হেরে ও তো এখন দাসী।"

এই সময় কর্ণও এই দলে ভিড়ে দ্রৌপদীকে অনেক খারাপ-খারাপ কথা বলেছিলেন, যা তাঁর মতো বীরপুরুষের পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। হয়তো স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী তাঁকে অপমান করেছিলেন বলে সেই রাগ তিনি পুষে রেখেছিলেন।

ভাইদের একে-একে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে যখন, তখনও কোনও ভাই আপত্তি করেননি। এখন দ্রৌপদীর এই অপমান ভীমের সহ্য হল না, রাগের চোটে তিনি যুধিষ্ঠিরের হাতটা পুড়িয়ে দেবার কথা বলতেই অর্জুন তাড়াতাড়ি তাঁকে শান্ত করলেন।

দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ বলল, "সত্যি তো, যুধিষ্ঠির নিজে হেরে যাবার পর দ্রৌপদীকে পণ রাখার অধিকার আর তাঁর থাকে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা হোক। দাসের তো কোনও অধিকারই থাকার কথা নয়।"

অনেকে মিলে ধমক দিয়ে বিকর্ণকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল।

ভীষ্ম বারবার বলতে লাগলেন, "ধর্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম। এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না।"

পাণ্ডবরা এখন দাস, তাঁদের রাজপোশাক ছেড়ে দাসের পোশাক পরতে হবে। পাঁচভাই পোশাক বদলে ফেললেন। দ্রৌপদী পোশাক বদলাবার জন্য অন্তঃপুরে যাওয়া দরকার। দুঃশাসন সে সুযোগ না দিয়ে তাঁর পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করলেন সেখানেই।

এই বিপদে দ্রৌপদী কৃষ্ণের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর বন্ধু, তাঁর সহায়। এই লজ্জা থেকে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁকে বাঁচাবেন।

যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমায় এই জায়গাটায় দেখা যায় যে দুঃশাসন যতই দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টানাটানি করুন, কিছুতেই শাড়ি ফুরোচ্ছে না, অদৃশ্য থেকে কৃষ্ণ একটা লাটাই থেকে অনবরত শাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

এ দৃশ্য কিন্তু মহাভারতে নেই।

শ্রীকৃষ্ণ তখন কাছাকাছি ছিলেন না। আর দ্রৌপদীও শাড়ি পরতেন না। তখনকার নারীরা পরতেন ঘাঘরা আর কাঁচুলি। তবে একটা অলৌকিক ব্যাপার হয়েছিল নিশ্চয়ই, ধর্ম নামে এক দেবতা নানারকম পোশাকে দ্রৌপদীর শরীর ঢেকে দিয়েছিলেন। দুঃশাসনই একসময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন।
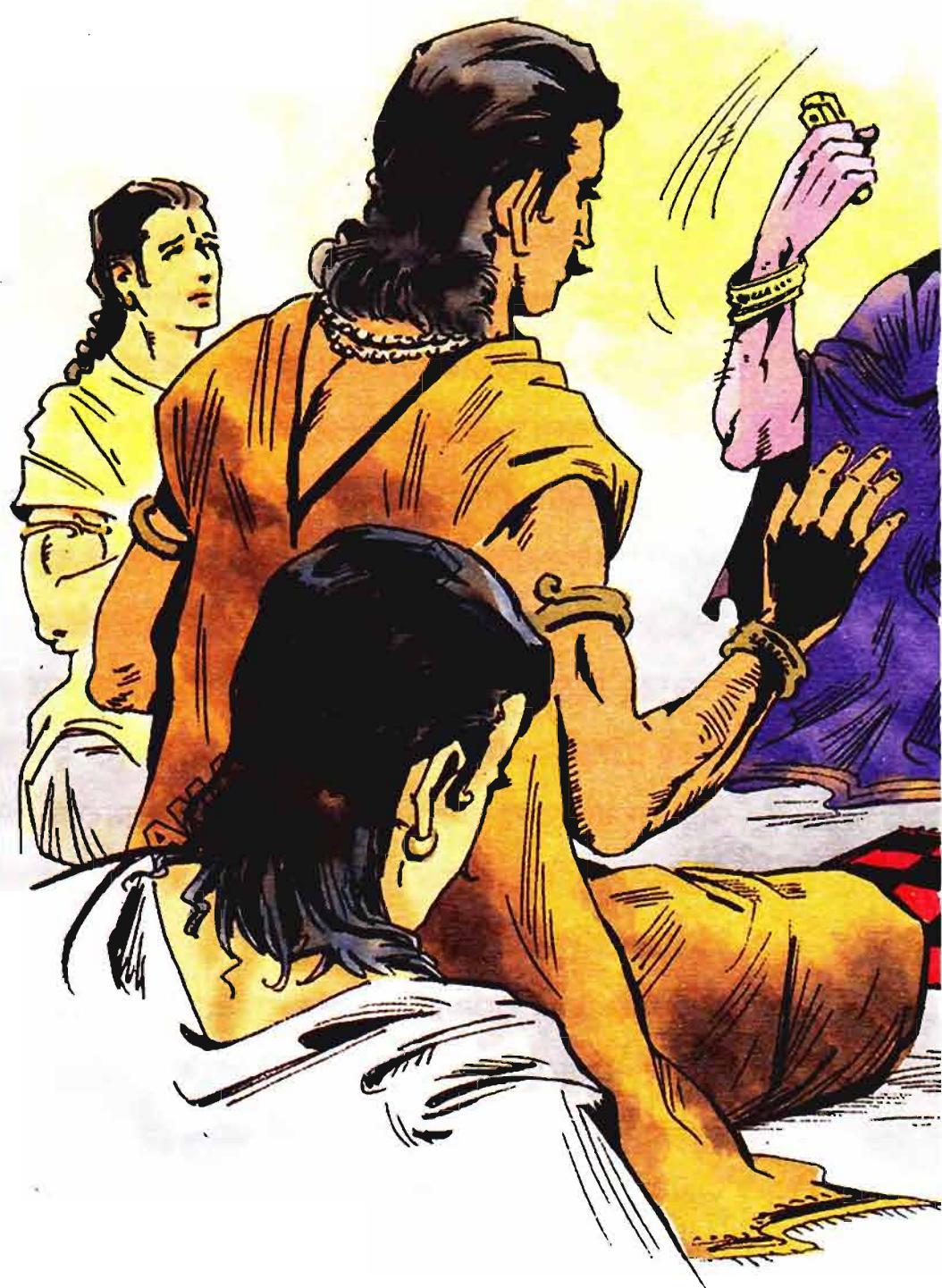
দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনা দেখে ভীম বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি এই দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করবেন। আর দুর্যোধনেরও অসভ্য ব্যাপার দেখে ভীম বললেন, "গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরু যদি ভেঙে না দিই তা হলে আমার নামই মিথ্যে।"

এবার সবাই বুঝল, ভীম আর অর্জুন মহাবীর! তাঁদের সামনে যেভাবে দ্রৌপদীর অপমান করা হল, এর প্রতিশোধ তাঁরা নেবেনই। ঘোর যুদ্ধ হবে। তখন কৌরবরা কি রক্ষা পাবেন?

এবার ধৃতরাষ্ট্রও বুঝলেন যে, পাশা খেলা চলছিল, বেশ ছিল, কিন্তু সভার মধ্যে দ্রৌপদীকে ডেকে এনে যে লাঞ্ছনা দেওয়া হল, তার ফল ভয়াবহ হতেই পারে।

ছেলেকে বকুনি দিয়ে তিনি দ্রৌপদীকে কাছে ডেকে বললেন, "পাঞ্চালী, তুমি আমার সব পুত্রবধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি আমার কাছে একটি বর চাও।"

চোখ থেকে কান্না মুছে দ্রৌপদী বললেন, "তা হলে আপনার বরে আমার স্বামী যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করুন, আর আমার ছেলেকেও যেন কেউ দাসপুত্র না বলে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "তাই হবে। তুমি আর একটা বর চাও।"

দ্রৌপদী বললেন, "যদি আর একটা বর দিতে চান, তা হলে

ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল আর সহদেবকেও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিন মহারাজ।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "তা হবে। তুমি আর একটা বর চাও। তোমাকে শুধু দু'টো বর দিয়েই আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।"

দ্রৌপদী বললেন, "আমি আর বর চাই না, তাতে আমার লোভের প্রকাশ হতে পারে। যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। আমার স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আবার কীর্তি লাভ করবেন।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, "তোমার মঙ্গল হোক। সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যাও। আগের মতনই ভাইদের নিয়ে রাজ্য শাসন করো। দুর্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে রেখো না। ক্ষমা করে দিয়ো।"

যাক, সবই ভালয়-ভালয় মিটে গেল। যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদী ও অন্য ভাইদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে চললেন।

তবু কিন্তু শান্তি ফিরে এল না।

দুর্যোধন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে অন্য এক জায়গায় গজরাতে লাগলেন, "এ কী করলেন বাবা? হাতের মুঠোয় সবকিছু পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয়? শত্রুকে যে-কোনও উপায়ে হোক, শেষ করতেই হয়। পাণ্ডবরা এরপর কোনও না-কোনও সময়ে প্রতিশোধ নেবেই।"

আবার একটা বুদ্ধি বের করে দুর্যোধন বাবার কাছে ফিরে গিয়ে

বললেন, "আমরা আর-একবার খেলতে চাই। এবারে আর টাকাপয়সা ইত্যাদির পণ নেই। একবারই খেলা হবে। যারা হারবে, তারা বারো বছরের জন্য বনবাসে যাবে, আর এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। তার মানে, তারা এমন ভাবে লুকিয়ে থাকবে, যাতে তাদের কোথাও দেখা না যায়। পাণ্ডবরা যদি তেরো বছর পর ফিরেও আসে, ততদিনে আমরা আমাদের এত শক্তি বাড়িয়ে ফেলব যে, ওরা আর কিছুই করতে পারবে না।"

ধৃতরাষ্ট্র রাজি হয়ে বললেন, "ডাকো-ডাকো, শিগগির পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনো।"

কৌরবদের মা গান্ধারী যদিও নিজে অন্ধ না হয়েও চোখে কাপড় বেঁধে রাখতেন, কিন্তু তিনি মোটেও পুত্রস্নেহে অন্ধ ছিলেন না। দুর্যোধনের অন্যায় আর পাপ কাজের জন্য তাঁকে তিনি ত্যাগ করতেও রাজি। আবার দুর্যোধনের এই কু-মতলবের কথা জেনে তিনি স্বামীর কাছে এসে অনেক অনুরোধ করলেন এই অন্যায় খেলা বন্ধ করার জন্য। এর ফলে ভবিষ্যতে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ধৃতরাষ্ট্র তা শুনলেন না, বললেন, "যা হওয়ার তা হবেই।"

পাণ্ডবরা তখনও নিজেদের রাজ্যে পৌঁছননি, তার মধ্যেই এক দূত গিয়ে বলল, "রাজা ধৃতরাষ্ট্র আবার আপনাদের একবার খেলার জন্য ডেকেছেন।"

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে, আবার তিনি এক বিরাট বিপদে পড়তে চলেছেন, তবু ফিরে এলেন ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে।

শকুনি তো দুর্যোধনের মামা, সেই হিসেবে যুধিষ্ঠিরেরও মামা। তাই ভালমানুষ সেজে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আগের বার যে আমার জামাইবাবু তোমাদের সব কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেটা কিন্তু ভাল কাজ করেছেন। এবারের পণ খুব সরল। আমরা যদি হারি, তা হলে সকলে মিলে বারো বছরের জন্য বনবাসে চলে যাব, আর এক বছর অজ্ঞাতবাস, তখন ধরা পড়ে গেলে আবার বারো বছর বনবাস। তোমরা যদি হারো, তা হলে তোমাদেরও এটা মানতে হবে।"

সেখানে অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলে মনে-মনে ভাবলেন, যুধিষ্ঠিরের কিছুতেই এ খেলা উচিত নয়। শকুনিকে তিনি হারাতে পারবেন না। শকুনি যদি জোচ্চুরিও করেন, সেটা ধরার মতো জ্ঞানও তাঁর নেই।

কিন্তু কেউ-ই যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করলেন না। যুধিষ্ঠির এই শর্তে রাজি হয়ে গেলেন।

প্রথমবার ঘুঁটি ফেলেই শকুনি বলে উঠলেন, "এই আমি জিতলাম।"

কৌরবপক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়লেন। মাথা নিচু করে রইলেন পাণ্ডবরা। তবে যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য চার ভাই মনে-মনে কঠোর

প্রতিজ্ঞা করলেন, ফিরে এসে কৌরবপক্ষের সবাইকে ধ্বংস করবেন, শকুনিকেও বাদ দেবেন না।

এবার তো বনবাসে যেতেই হয়।

জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় জননী কুন্তী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। এখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, তিনি থাকবেন তাঁর দেওর বিদুরের বাড়িতে। দ্রৌপদী যাবেন পঞ্চস্বামীর সঙ্গে। এঁরা সবাই গুরুজনদের প্রণাম করে বিদায় চাইলেন। সকলেরই চোখে জল।

পাণ্ডবরা রাজধানী ছেড়ে চলে যাবার পর অস্ত্রগুরু দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন, "হেমন্তকালে তালগাছের ছায়া বেশিক্ষণ থাকে না। তুমি যে এত আনন্দ-স্ফূর্তি করছ তাও ক্ষণস্থায়ী। এর মধ্যে যা পারো, দান আর ভোগ করে নাও। তেরো বছর পর তুমি আর কি সময় পাবে!"

পঞ্চপাণ্ডব প্রথমেই এলেন কাম্যক বনে। সে এক নিবিড়, ভয়াল অরণ্য। সেখানে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই ঝামেলা হল, এক বিকট চেহারার রাক্ষস তেড়ে এল তাঁদের দিকে। তার গর্জনে বনের পশুরা ভয়ে পালাতে লাগল দিগ্বিদিকে।

অর্জুন ধনুক-বাণ হাতে নিলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে ছেঁটে ফেললেন ডালপালা। যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে? কী চাও?"

সেই রাক্ষস বলল, "আমার নাম কির্মীর। আমি বকরাক্ষসের ভাই, যাকে ব্রাহ্মণ সেজে গিয়ে ভীম বধ করেছে। হিড়িম্বও আমার বন্ধু ছিল। আজ আমি তার প্রতিশোধ নেব। ভীমকে খাব।"

কিন্তু ভীমকে খাওয়া কি সোজা কথা? অর্জুনের সাহায্য লাগল না, ভীম একাই কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের পর সেই রাক্ষসের সব হাড়গোড় ভেঙে দিলেন।

এরপর আর কোনও রাক্ষস ভয়ে তাঁদের কাছে এল না।

পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর সঙ্গে-সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতও এসেছেন। তাঁরা এঁদের ছেড়ে থাকতে চান না। কিন্তু এত মানুষের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করাও তো খুব সমস্যার ব্যাপার, দ্রৌপদী এসব কী করে সামলাবেন?

তখন ধৌম্য ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "সূর্যদেবতার জন্যই আমরা বেঁচে থাকার সব অন্ন পাই, তুমি সূর্যের স্তব করো, আমি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি।"

যুধিষ্ঠির স্নান করে এসে শুদ্ধ মনে সূর্যদেবতার পুজো করতে লাগলেন। এক সময় সূর্যদেবতার আবির্ভাব হল।

তিনি বললেন, "রাজা তোমাদের কী অভাব, তা আমি জানি। বনবাসের বারো বছর আমি তোমাদের অন্নের ব্যবস্থা করব।"

তিনি দ্রৌপদীকে একটা তামার তৈরি পাত্র দিয়ে বললেন, "তুমি

যখন যা রান্না করবে, এই পাত্রে রাখবে। তারপর সকলকে খেতে দেবে। সকলেই ঠিকঠাক খেতে পাবে।”

এত মানুষ, অথচ একটা মাত্র পাত্রের খাবার? দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে চাইলেন এই অলৌকিক ব্যাপার। সত্যিই, দ্রৌপদী অনেক কিছু রান্না করে রাখলেন ওই একটি পাত্রে। তারপর পরিবেশন করতে লাগলেন। অত মানুষ, তবুও ফুরোয় না। একেবারে শেষে যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদী নিজেরা যখন খাওয়া শেষ করলেন, অমনি পাত্রটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল।

যাক, মিটে গেল ওঁদের খাদ্যসমস্যা।

এর মধ্যে একদিন সদলবলে কৃষ্ণ এসে হাজির।

পাশা খেলাকে কেন্দ্র করে এত কাণ্ড যে ঘটে গিয়েছে তা তিনি কিছুই জানতেন না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যখন কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় শাল্ব নামে এক রাজা দ্বারকা আক্রমণ করেন। এই রাজা আবার কিছু-কিছু জাদু জানেন। কৃষ্ণ যখন ছিলেন না, তখন শাল্ব দ্বারকার অনেক কিছু ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ প্রবল যুদ্ধে সেই শাল্বকে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে দু’ টুকরো করে দেন।

তারপর পাণ্ডবদের এই নিদারুণ খবর শুনেই তিনি কাম্যক বনে ছুটে এসেছেন। তিনি বারবার আফশোসের সঙ্গে বলতে লাগলেন,

ঠিক সময় খবর পেলে তিনি কিছুতেই এই অন্যায় পাশা খেলা হতে দিতেন না। তা হলে এই সর্বনাশও হত না।

কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে সবাই তাঁদের দুঃখ ও রাগের কথা জানাতে লাগলেন।

কৌরবরা সবচেয়ে বেশি অপমান করেছেন দ্রৌপদীকে, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। দ্রৌপদী কাঁদতে-কাঁদতে মুখ ঢেকে বললেন, "হে কৃষ্ণ, আমার স্বামী নেই, সন্তান নেই, বন্ধু নেই, ভাই নেই, পিতা নেই, তুমিও নেই। ওরা সব যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন কেউ বাধা দিতে যায়নি। কর্ণ আমাকে যে উপহাস করেছিল, তা এখনও আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে। কৃষ্ণ, তুমি আমার আপনজন, বন্ধু, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না?"

কৃষ্ণ বললেন, "যারা তোমাকে অপমান করেছে, তারা কেউ নিস্তার পাবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি আবার রাজেন্দ্রাণী হবে। যদি আকাশ ভেঙে পড়ে, যদি হিমালয় ছোট হয়ে যায়, পৃথিবী খণ্ড-খণ্ড হয়, সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, তা হলেও আমার এই কথা মিথ্যে হবে না!"

তেরো বছর পর ফিরে গিয়ে যুদ্ধ হবে, ভীমের অত ধৈর্য নেই। দ্রৌপদীও প্রতিশোধ নেবার জন্য এক্ষুনি ফিরে যেতে চান, সে-কথা ওঁরা বারবার বলতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের জন্যই যে

সকলকে বনবাসের কষ্ট পেতে হল, তাও শোনাতে ছাড়লেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, "হ্যাঁ, দোষ আমারই, তোমরা আমায় গঞ্জনা দিতেই পারো। আমিই দুর্যোধনের রাজ্য জয় করে নেওয়ার ইচ্ছেতে পাশা খেলতে রাজি হয়েছিলাম। শকুনি কৌশল করে আমাকে হারিয়েছেন। আমরা সবাই দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়েছিলাম, দ্রৌপদীই উদ্ধার করেছে আমাদের। তারপরও আমি আর একবার পাশা খেলায় রাজি হয়ে তোমাদের এই দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছি। এজন্য ভীম, তুমি আগেই আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? আমাকে কেন বাধা দিলে না? এখন যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বারো বছর বনে থাকব আর এক বছর অজ্ঞাতবাসে, এ প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারব না!"

তা হলে তেরো বছরের আগে কিছুই করা যাবে না!

কৌরবরা এর মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তাঁদের দলেও বড়-বড় বীর আছেন, সুতরাং পাণ্ডবদেরও সেই মতো অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা দরকার। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "তুমি পাহাড়ে যাও, বিভিন্ন দেবতার তপস্যা করে তাঁদের বর নিয়ে এসো।"

ঘুরতে-ঘুরতে অর্জুন হিমালয় আর গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রনীল নামে এক পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখা পেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের। তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার পর অর্জুন শিবের আরাধনায় বসলেন।

একদিন সেখানে এক কিরাত তার স্ত্রী ও অন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়-জঙ্গলে তো এ রকম কিরাত জাতি থাকেই। হঠাৎ একটা বিরাট বুনো শুয়োর অর্জুনের দিকে তেড়ে এল। অর্জুন সেটাকে মারার জন্য ধনুকে তির জুড়তেই কিরাত বলে উঠল, "এই বরাহটাকে আমিই আগে মারব ঠিক করেছি।"

অর্জুন সেকথা গ্রাহ্য করলেন না। কিরাত আর তিনি একই সঙ্গে তির ছুড়লেন, দু'জনের তিরেই বরাহের মৃত্যু হল।

সামান্য একজন কিরাতের এই আস্পর্ধা দেখে রেগে গেলেন অর্জুন। তিনি বললেন, "তুমি মৃগয়ার নিয়ম জানো না? একজন তির ছুড়লে অন্য কেউ কিছু করতে পারে না। আজ আমার হাতে তোমার মৃত্যু অবধারিত।"

কিরাত হেসে বলল, "আমরা তো এই বনে-জঙ্গলেই থাকি। তুমি এখানে কেন এসেছ? কী চাও?"

উত্তর না দিয়ে অর্জুন তির ছুড়লেন তার দিকে। কিরাত দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল, তার কিছুই হল না।

এরপর মহাবীর অর্জুন আরও অজস্র তির ছুড়লেন, তাঁর তূণীরের সব তির প্রায় ফুরিয়ে গেল, তবুও কিরাতের শরীরে একটা আঁচড়ও লাগল না। তখন তির-ধনুক বাদ দিয়ে খড়্গ আর অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে গেলেন, তাতেও কিছু ফল হল না। শেষ পর্যন্ত অর্জুন

মুষ্ট্যাঘাত অর্থাৎ ঘুসি মারতে গেলেন। তখন কিরাত তাঁকে বুকে চেপে ধরে রইল একটুক্ষণ, তারপর শুইয়ে দিল মাটিতে।

অর্জুন কখনও পরাজিত হন না, শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার স্বীকার করতে হল এক অচেনা কিরাতের কাছে? রাগে-দুঃখে তিনি তক্ষুনি মহাদেবের পূজা করতে বসলেন।

তখন দারুণ অবাক হয়ে অর্জুন দেখলেন, তিনি মহাদেবের নামে যে ফুল-মালা উৎসর্গ করছেন, সবই পড়ছে কিরাতের মাথায়।

ইনিই স্বয়ং শিব? অর্জুন এবার তাঁর পায়ে গিয়ে পড়লেন।

শিব তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমার মঙ্গল হোক। তুমি কী বর চাও?"

অর্জুন বললেন, "কৌরবের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। আপনার কাছে যে সাংঘাতিক পাশুপত অস্ত্র আছে, তা আমাকে দিন।"

শিব খুশি মনে অর্জুনকে সেই অস্ত্র দিয়ে তার ব্যবহারও শিখিয়ে দিলেন।

এর পর অর্জুনের বাবা ইন্দ্র নিজের রথ পাঠিয়ে ছেলেকে নিয়ে এলেন স্বর্গলোকে।

আমরা জানি যে, মানুষ মৃত্যুর পরেই শুধু স্বর্গে যেতে পারে। কিন্তু সেকালে কিছু-কিছু মানুষ স্বর্গে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার

ফিরে আসতে পারত। অর্জুনকে আরও অনেক দেবতা নানারকম অস্ত্র দিলেন। সেখানে গন্ধর্ব চিত্রসেনের বাড়িতে থাকার সময় অর্জুন নাচ-গান শিখেও কাটালেন কিছুদিন।

এদিকে অর্জুন নেই বলে পাণ্ডবদের মন খারাপ। ভীম মাঝে-মাঝেই ফুঁসে-ফুঁসে ওঠেন, যুদ্ধ শুরু করে দিতে চান। যুধিষ্ঠির শান্ত করেন তাঁকে।

এর মধ্যে অনেক মুনি-ঋষি এসে তাঁদের নানারকম গল্প শোনান, তাতেই অনেক সময় কেটে যায়। তারপর যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন, এক বনে আর বেশি দিন থাকবেন না, ঘুরে-ঘুরে বেড়াবেন। কিছু-কিছু ঋষিও চললেন তাঁদের সঙ্গে। খাওয়ার তো চিন্তা নেই, এঁরা সঙ্গে আসায় একটা লাভ হল এই, যে-কোনও নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার ইতিহাস ও অনেক রকম কাহিনি বলে দিতে পারেন।

সে তো গল্পের পর-গল্প, অনেক গল্প।

ঘুরতে-ঘুরতে একসময় পাণ্ডবরা বদরিকাশ্রমে এসে থাকতে লাগলেন কয়েক দিন। এর মধ্যে হঠাৎ একটা দারুণ সুন্দর পদ্মফুল হাওয়ায় উড়তে-উড়তে এসে দ্রৌপদীর সামনে পড়ল। দ্রৌপদী সেই পদ্মের সুগন্ধ নিয়ে ভীমকে বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে করছে, এই রকম আরও অনেক পদ্ম পেতে। তুমি আমার জন্য এনে দিতে পারবে না?"

ভীম সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। দ্রৌপদীকে খুশি করার জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লেন ভীম। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি চলে এলেন গন্ধমাদন পর্বতের কাছে। এই পাহাড়ে নানারকম গাছ, লতা-পাতা আর কতরকমের যে ফুল ফুটে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। তা হলে এখান থেকেই সেই পদ্মটা উড়ে যাওয়া সম্ভব।

অনেক দিন পর ভীমের মনে বেশ একটা ফুরফুরে ভাব এল। দাদার দোষে রাজ্য হারিয়ে বনে-বনে থাকতে হচ্ছে, সে জন্য কত কষ্ট হচ্ছে দ্রৌপদীর, প্রায়ই সে মন খারাপ করে থাকে, এবার এই পদ্মফুল নিয়ে গেলে সে খুশি হবে। সেখানে একটা সরোবর আছে বটে, কিন্তু ঠিক সেরকম পদ্ম নেই, যে-পদ্মের অনেক পাপড়ি। জলে নেমে ভীম কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর আবার এগোলেন সেই পদ্মের সন্ধানে।

পাহাড়ের মাঝখানে একটা পথ ধরে একটু এগোতেই ভীম দেখলেন, সেই পথের মধ্যে একটা হনুমান শুয়ে আছে। পথটা সরু, হনুমানটিকে না সরালে এগনো যাবে না। ভীম কাছে এসে এক হুংকার দিলেন। হনুমানটা চোখ পিটপিট করে বলল, "তুমি কে হে? আমি অসুস্থ, বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম, তুমি আমাকে জাগালে কেন?"

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "তুমি কে? পথ ছেড়ে দাও!"

হনুমানটি বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি একটি বানর। এই পথ দিয়ে দেবলোক যাওয়া যায়, কোনও মানুষ যেতে পারে না। তুমি যাবার চেষ্টা করলেই তোমার মৃত্যু হবে।"

ভীম বললেন, "মৃত্যু হবে কি না সে আমি বুঝব। তুমি পথটা তো ছাড়ো!"

হনুমান বলল, "আমি পথ ছাড়ব না। তুমি যদি যেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও!"

ভীম বললেন, "কোনও জীবিত প্রাণীকে ডিঙিয়ে যেতে নেই। সরো, সরে যাও।"

হনুমান বলল, "আমি অসুস্থ, বুড়ো হয়েছি। নড়াচড়া করতে পারি না। তুমি আমার ল্যাজটা ধরে টেনে সরিয়ে দাও!"

ভীম অবজ্ঞার সঙ্গে তার ল্যাজ ধরে এক টান মারলেন। এক চুলও সরাতে পারলেন না। তারপর দু' হাত ধরে টানাটানি শুরু করলেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেল। কিছুতেই না পেরে ধপাস করে বসে পড়লেন।

তখন ভীম হাত জোড় করে বললেন, "বুঝতে পারছি, আপনি সাধারণ কেউ নন। আমায় ক্ষমা করুন। সত্যি করে বলুন, আপনি কে?"

ইনি হলেন রামায়ণের সেই মহাবীর হনুমান। রামের আশীর্বাদে তিনি অমর। ইনি আবার এক হিসেবে ভীমের বড় ভাই, কারণ,

হনুমান পবনের পুত্র আর ভীমেরও জন্ম পবনদেবের আশীর্বাদে। দু'জনে অনেক গল্প হল। হনুমান বললেন, “এই পথ দিয়ে মানুষের যাওয়া নিষেধ, তাই তোমাকে আটকেছিলাম। কিন্তু তুমি তো ভীম, তোমাকে কে আটকাবে? তুমি যে পদ্ম খুঁজতে এসেছ, তা কাছেই একটা নদীতে পাবে।”

হনুমানকে প্রণাম করে ভীম এগিয়ে গেলেন। একটু পরে দেখতে পেলেন এক বড় নদী, তার জল অতি স্বল্প আর নির্মল, সেখানে ফুটে আছে এই অপরূপ সুন্দর পদ্মফুল। এই জায়গাটা যক্ষরাজ কুবেরের, তাঁর প্রচুর ধনসম্পদ আর অনেক সৈন্যসামন্ত। ভীমকে দেখে সেই সৈন্যরা এসে বলল, “এখানে কুবেরের অনুমতি না নিয়ে কেউ নদীতে নামতে পারে না।”

ভীম শান্ত ভাবে বললেন, “ক্ষত্রিয়রা কারও কাছে কিছু চায় না। তা ছাড়া পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীতে নামার অধিকার সকলেরই থাকে।”

তবু তারা ভীমকে বাধা দিতে এলে ভীম অবহেলার সঙ্গে তাদের ছুড়ে-ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। অনেকে হতাহত হল। একজন গিয়ে খবর দিল কুবেরকে।

কুবের সহাস্যে বললেন, “দ্রৌপদীর জন্য ভীম পদ্মফুল নিতে এসেছে, নিক না। বাধা দিয়ো না।”

॥ ৭ ॥

একরাশ পদ্মফুল তুলে নিয়ে ভীম ফিরে এলেন আর ফুলগুলো তুলে দিলেন দ্রৌপদীর হাতে।

পাণ্ডবদের বনবাসের চার বছর কেটে গিয়েছে। এখনও আরও আট বছর বাকি, তার পরেও আর একটা বছর থাকতে হবে অজ্ঞাতবাসে। তার মানে, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে, যাতে কেউ চিনতে না পারে।

বনের মধ্যে পাণ্ডবদের সময় কাটে কী করে? ওঁদের সঙ্গে মুনি-ঋষিদের একটা দলবল আছে। সন্ধের সময় সবাই এক জায়গায় বসে গল্প শুরু হয়। মুনি-ঋষিরা অনেক গল্প জানেন, সেসব গল্প দারুণ আকর্ষক। তার এক-একটা গল্প নিয়ে পরে আলাদা-আলাদা বই কিংবা নাটক লেখা হয়েছে। আমরা পরে সেই গল্পগুলো পড়ে নেব। তার মধ্যে অন্তত দু'টি গল্প না বললেই নয়।

একটা হচ্ছে, অগস্ত্য ঋষির কাহিনি। তিনি এক মহাঋষি, অসাধারণ

তাঁর ক্ষমতা। তাঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

এক দেশে ইল্বল নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন, তিনি নানারকম জাদুবিদ্যা জানতেন। কারও উপর রাগ হলে তিনি অদ্ভুত ভাবে প্রতিশোধ নিতেন। একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁর একটা অনুরোধ রক্ষা করেননি বলে ইল্বল খুবই রেগে গেলেন, কিন্তু বাইরে রাগ না দেখিয়ে বরং খাতির করে সেই ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করলেন রাজপ্রাসাদে। ইল্বলের এক ভাই ছিল, তার নাম বাতাপি। ইল্বল মন্ত্রবলে তাঁর ভাইকে একটা ভেড়া বানিয়ে ফেললেন, তারপর তাকে কেটেকুটে সেই মাংস রান্না করে খাইয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ কোনও সন্দেহ না করে সেই মাংস যেই খেয়ে ফেললেন, ইল্বল অমনি দু' বার ডাকলেন, "বাতাপি, বাতাপি।" অমনি তাঁর ভাই ব্রাহ্মণের পেট ছিন্নভিন্ন করে মানুষের মতো বাইরে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল।

এই ভাবে ইল্বল অনেককে হত্যা করেছেন।

একদিন অগস্ত্য এলেন ইল্বলের রাজপুরীতে। ইল্বল তাঁকে খাতির করে চুপি-চুপি তাঁর ভাইকে ভেড়া বানিয়ে সেই মাংস খেতে দিলেন অগস্ত্যকে। তারপর ডাকতে লাগলেন, "বাতাপি, বাতাপি!" কোনও সাড়া নেই। আবার তিনি ডাকলেন, "আয় তো ভাই বাতাপি।"

অগস্ত্য মেঘের গর্জনের মতো একটা ঢেকুর তুলে সহাস্যে বললেন, "যতই ডাকো, কোনও লাভ নেই। আমি তাকে হজম করে ফেলেছি।"

তখন ইল্বল ক্ষমা চেয়ে অগস্ত্যকে একটা সোনা-বাঁধানো রথ আর দু'টি সুন্দর ঘোড়া উপহার দিলেন।

আর একবার দেবতারা দল বেঁধে এলেন অগস্ত্যের কাছে সাহায্য চাইতে। তখন দেবতা ও দৈত্যের মধ্যে প্রায়ই লড়াই বাধত। দৈত্যরা দিনেরবেলায় সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকে, রাতেরবেলা উঠে এসে সবাইকে মারতে শুরু করে, তাই ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না। দেবতারা অগস্ত্যকে বললেন, "আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।" দেবতাদের অনুরোধ শুনে অগস্ত্য এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতীরে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, দু'হাত জুড়ে জলপান করতে লাগলেন। তিনি চোঁ-চোঁ করে জল টেনে যাচ্ছেন তো টেনেই যাচ্ছেন, থামছেন না। একসময় পুরো সমুদ্রের জল শেষ হয়ে গেল, তখন দেখা গেল অসংখ্য মাছ, জলের প্রাণীদের মধ্যে বসে আছে দৈত্যদের দলবল। তখন যুদ্ধে অনেক দৈত্যদানব নিহত হল, কিছু-কিছু পালিয়েও গেল।

মধ্য ভারতে বিন্ধ্য নামে একটা পর্বত আছে, এক সময় সে খুব অহংকারী হয়ে উঠল। একদিন সে সূর্যকে ডেকে বলল, "তুমি আমার মাথার উপর দিয়ে যেতে পারবে না, মেরু পর্বতের পাশ দিয়ে যেমন

ঘুরে যাও, সেইরকম আমারও পাশ দিয়ে ঘুরে যাবে।”

সূর্য বললেন, “আমি তো ইচ্ছেমতন কোনও পর্বতকে প্রদক্ষিণ করি না। এই বিশ্বের যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিয়মেই আমি যাই।”

এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিন্ধ্য পর্বত উঁচু হতে শুরু করল। এক সময় তার চুড়ো ঠেকে গেল আকাশে। চাঁদ বা সূর্য আর তার মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে না।

এতে তো জগৎ একেবারে অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেবতারা আবার দৌড়ে এলেন অগস্ত্যের কাছে। অগস্ত্য তখন তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রাকে নিয়ে এলেন বিন্ধ্য পর্বতের কাছে। মহাঋষি অগস্ত্যের তখন এমন প্রতাপ ও নামডাক যে, এমনকী পাহাড়ও তাঁকে ভয় পায়। বিন্ধ্য পর্বত মাথা নিচু করে তাঁকে প্রণাম জানাল। অগস্ত্য তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “আমি এখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, তুমি পথ ছেড়ে দাও। তারপর আমি ফিরে এলে তুমি আবার উঁচু হোয়ো, যত তোমার ইচ্ছে!”

অগস্ত্য সে পথ দিয়ে আর কোনওদিনই ফিরে আসেননি, বিন্ধ্য পর্বতেরও অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য, এখনও কেউ যদি কোথাও যাত্রা করে আর ফিরে না আসে, তাকে বলে ‘অগস্ত্যযাত্রা’।

এবার পরশুরামের কথা। এই পরশুরাম মহাভারতের কাহিনিতে

মাঝে-মাঝেই দেখা দিয়েছেন, আবার রামায়ণেও তিনি আছেন। ইনি যে অমর।

একসময় জমদগ্নি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রেণুকা, তাঁদের পাঁচটি ছেলে, সবচেয়ে ছোটটির নাম পরশুরাম। একদিন রেণুকা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অন্যান্য লোকজন দেখে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়েই ফিরে এলেন আশ্রমে। তা দেখে রেগে গেলেন জমদগ্নি, অন্য লোকজনদের সামনে দিয়ে ভিজে কাপড়ে আসা উচিত হয়নি বলে বকাবকি করতে লাগলেন স্ত্রীকে। রেণুকা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেই ঝগড়া লেগে গেল। ক্রমে জমদগ্নি এমনই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, নিজের বড়ছেলেকে বললেন, "তোমার মায়ের মুন্ডুটা কেটে ফ্যালো তো!"

সেকালে পিতার আদেশ কোনও পুত্রই অগ্রাহ্য করতে পারত না। বাবা যত অন্যায় আদেশই করুন না কেন। যেমন, রামায়ণে রাজা দশরথ অন্যায় ভাবেই তো বিনা দোষে রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। রাম কিন্তু একটুও গজগজ পর্যন্ত করেননি। কিন্তু বাবার হুকুমেও কি মাকে মেরে ফেলা যায়? বড়ছেলেটি বলল, "আমি পারব না।"

আর জমদগ্নি পরপর তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানকে এই একই আদেশ করলেন। তারা কেউ মাতৃহত্যা করতে রাজি নয়।

জমদগ্নি রেগেমেগে চার ছেলেকে অভিশাপ দিলেন, “তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাক, তোরা বোকা-হাবা হয়ে থাক।”

এই সময় আশ্রমে ফিরে এল ছোটছেলে। জমদগ্নি তাকে বললেন, “আমার আদেশ, তুমি তোমার মাকে হত্যা করো!”

পরশুরাম একটুও দ্বিধা না করে পিতৃআজ্ঞায় একটা খড়্গ নিয়ে ঘচাং করে কেটে ফেলল মায়ের মুণ্ড।

এতক্ষণে জমদগ্নির ক্রোধ কমল। ছোটছেলেকে বললেন, “বৎস, আমি তোমার উপর খুশি হয়েছি, তুমি বর চাও।”

পরশুরাম বললেন, “আমার মা এক্ষুনি বেঁচে উঠুক। আর এই বীভৎস কাণ্ডের কোনও স্মৃতিই যেন আমার না থাকে। আর এতে যেন আমার কোনও পাপ না হয়।”

বাবা বললেন, “তথাস্তু। আর?”

পরশুরাম বললেন, “আমার চার ভাই আবার স্বাভাবিক মানুষের মতো হয়ে উঠুক।”

জমদগ্নি বললেন, “তথাস্তু, আর?”

পরশুরাম বললেন, “আমি যেন যুদ্ধবিদ্যায় সবার চেয়ে সেরা হই, আর আমার আয়ু যেন বহুদিন বেড়ে যায়।”

জমদগ্নি সে বরও দিলেন প্রিয় পুত্রকে। আশ্রমে আবার শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ সেখানে আবার একটি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

কার্তবীর্য নামে ছিলেন এক অত্যাচারী রাজা। তিনি এত দ্রুত অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন যে, লোকে বলে তাঁর নাকি এক হাজারটা হাত। তাঁর ছেলেরাও খুব ডাকাবুকো। তারা লোকদের মারধর আর লুঠপাট করে বেড়াত। তাদের জ্বালায় দেবতা ও ঋষিরাও অতিষ্ঠ। একদিন হঠাৎ কার্তবীর্য, যাঁর পুরো নাম কার্তবীর্যার্জুন, চলে এলেন জমদগ্নি মুনির আশ্রমে। সেখানে দেখলেন গাছে-গাছে নানান রকম সুস্বাদু ফল ফলে আছে, আর আছে অনেক ভাল-ভাল গোরু। কার্তবীর্য আর তাঁর সৈন্যরা সব গাছের ফল ছিঁড়ে গাছগুলো ভেঙে লন্ডভন্ড করে, গোরুগুলোকেও হরণ করে নিয়ে চলে গেল। খানিক পরে পরশুরাম আশ্রমে ফিরে সেই অবস্থা দেখলেন আর বাবার মুখে সব শুনলেন। তক্ষুনি তিনি জোরে ছুটে গেলেন সেই অত্যাচারী রাজার খোঁজে। বেশি দূর যেতে পারেননি, কার্তবীর্যকে পেয়েও গেলেন পরশুরাম। সম্মুখ যুদ্ধে আগে তিনি কার্তবীর্যের হাত কেটে ফেললেন, তারপর এক ভল্লের আঘাতে কেটে ফেললেন মাথা। তারপর পরশুরামের রাগ মিটল।

কিন্তু সব মিটল না। আবার একদিন, আশ্রমে ছেলেরা কেউ নেই, জমদগ্নি ঋষি একা বসে তপস্যা করছেন, এমন সময় এসে পড়ল

কার্তবীর্যের ছেলেরা। তারা মারতে শুরু করল বৃদ্ধ ঋষিকে। তিনি অসহায় ভাবে, 'রাম, পরশুরাম' বলে ডাকতে লাগলেন, একটুক্ষণের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন।

পরশুরাম ফিরে এসে দেখতে পেলেন নিহত পিতাকে। আশ্রমের দু'-একজনের মুখে শুনলেন কার্তবীর্যের ছেলেদের কথা। পরশুরাম একাই গেলেন তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এমনিতেই তিনি মহাবীর, তার উপর বর পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে, যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কার্তবীর্যের সব ক'টি ছেলে আর সৈন্যসামন্ত তিনি ধ্বংস করে ফেললেন। তার পরে রাগে পরশুরামের শরীর জ্বলছে। রাগ হল সমস্ত রাজারাজড়া আর ক্ষত্রিয় জাতির উপর। এরপর তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করতে লাগলেন। একসময় পৃথিবীতে আর একজনও ক্ষত্রিয় রইল না। এইভাবে নাকি পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়দের নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন, শুধু তাঁদের রক্তেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল পাঁচটা হ্রদ।

একসময় মুনি-ঋষিরা এসে বললেন, "পরশুরাম, থামো থামো! আর হিংসা কোরো না। ক্ষত্রিয়দের ক্ষমা করে দাও।"

পরশুরাম তখন হাতের রক্তাক্ত কুঠারটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে যজ্ঞ করতে বসলেন। পৃথিবীতে তখন আর কোনও রাজা নেই, পরশুরাম সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি তখন কশ্যপ নামে এক পরম শ্রদ্ধেয়

মুনিকে গোটা পৃথিবীটা দান করে দিয়ে চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে। সেখানেই তিনি সব সময় থাকেন।

এই পরশুরাম একসময় কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক দুর্দান্ত অস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা তিনি কর্ণকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভুল বুঝে তিনি কর্ণকে একটা চরম অভিশাপও দিয়েছিলেন। সে-কথা আমরা যথাসময়ে শুনব।

পাণ্ডবরা খুব বেশিদিন এক বনে থাকেন না। ঘুরে-ঘুরে বেড়ান, অনেক তীর্থস্থানেও যান। অর্জুন চলে গিয়েছেন অস্ত্রশিক্ষা করতে দূর বিদেশে, তাঁর কথা সবারই মনে পড়ে। মাঝে-মাঝে দস্যুদানবরা ওঁদের আক্রমণ করতে আসে, তখন ভীম একাই সব সামলে দেন। ভীম কোনও কারণে দূরে গেলে তাঁর ছেলে ঘটোৎকচ সাহায্য করতে আসে।

পঞ্চম বছরে ফিরে এলেন অর্জুন। তাঁরও কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে এর মধ্যে। অস্ত্রের সন্ধানে তিনি কত জায়গায় গিয়েছেন, এমনকী, একবার মহাদেবের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন স্বর্গে। তখনকার দিনে কিছু মানুষ জ্যান্ত অবস্থাতেও যেতেন স্বর্গে, আবার ফিরেও আসতেন। স্বর্গ বোধ হয় কাছাকাছিই কোথাও ছিল।

নানান অরণ্যে ভ্রমণ করতে-করতে এক জায়গায় পাণ্ডবদের এক

দারুণ বিপদের সম্মুখীন হতে হল। একদিন এমন একটা জায়গায় পৌঁছলেন, যেখানে কোনও নদী নেই, হ্রদ নেই। জল ছাড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না, পাণ্ডবরা সবাই খুব তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে নকুল একটা বটগাছে চড়ে দেখতে লাগলেন, দূরে কোথাও জলাশয় আছে কিনা। জল দেখা যাচ্ছে না, তবে একদিকে কিছু সারস উড়ছে দেখে মনে হল, ওখানে জল থাকতেও পারে।

যুধিষ্ঠির বললেন, "তুমি পাত্র নিয়ে সেদিকে যাও, জল নিয়ে এসো।"

নকুল খুঁজতে-খুঁজতে অনেকটা দূর গিয়ে একটা দিঘি দেখতে পেলেন। আগে নিজে একটু জল পান করে নেবেন ভেবে নকুল যেই সেই জলে হাত ডোবাতে গিয়েছেন, অমনি অদৃশ্য ভাবে কে যেন বলল, "ওহে বৎস, এই জলাশয় আমার। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল খাও।"

নকুল এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'ধুত' বলে যেই জল খেতে গিয়েছেন অমনি তাঁর মৃত্যু হল।

নকুল আসছেন না, আসছেনই না। সকলে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির সহদেবকে বললেন, "তুমি যাও তো, দ্যাখো, নকুলের কী হল, আর জলও নিয়ে এসো।"

সহদেব সেই জলাশয়ে গিয়ে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং তা অগ্রাহ্য করে জল ছুঁতে গিয়েই প্রাণ হারালেন। এরপর একে-একে অর্জুন ও ভীমও গেলেন, তাঁরাও আর ফিরলেন না।

এর পর যুধিষ্ঠিরকে যেতেই হল। বনবাসী হয়েও তিনি তো রাজা, এত সাধারণ কাজে তাঁর যাবার কথা নয়। কিন্তু তেষ্টায় দ্রৌপদী আর সবাই ছটফট করছেন, তাই তাঁকে যেতেই হল।

যুধিষ্ঠির সেই জলাশয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর চার ভাই সেখানে মরে পড়ে রয়েছেন। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড, যুদ্ধের কোনও চিহ্ন নেই, তবু এই চারজন কী করে মৃত্যু বরণ করলেন? যুধিষ্ঠির অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই দুর্যোধন কিংবা শকুনি কোনওরকম গুপ্ত কৌশলে এঁদের হত্যা করিয়েছেন।

কিন্তু তৃষ্ণা এমনই প্রবল যে, সবরকম শোকও একপাশে সরিয়ে দেয়। যুধিষ্ঠির কান্না থামিয়ে সেই সরোবরে নেমে জল পান করতে গেলেন। তখন তিনিও তাঁর ভাইদের মতো শূন্য থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনলেন, "সাবধান, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি যদি জল খাও, তা হলে তোমারও ভাইদের মতো দশা হবে।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

উত্তর শোনা গেল, "আমি বক।"

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, "বক? আমার ভাইরা মহাবীর,

তাদের একসঙ্গে হত্যা করতে পারে, এমন শক্তিশালী কে আছে? আপনার সত্যি পরিচয় বলুন।"

তখন আবার উত্তর এল, "আমি যক্ষ!"

তারপর দেখা গেল তালগাছের মতো লম্বা, সারা গা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে, এরকম একজন পুরুষকে। বজ্রের মতো গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, "রাজা, আমি অনেকবার নিষেধ করেছি, তোমার ভাইরা শোনেনি। তুমিও যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও..."

যুধিষ্ঠির বললেন, "ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব।"

এর পর যক্ষ পর-পর ন'টা প্রশ্ন করেছিলেন, খুব শক্ত-শক্ত প্রশ্ন, তবু যুধিষ্ঠির সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। সেসব আমাদের না জানলেও চলবে। শুধু একটা প্রশ্ন আমরা বুঝে নিতে পারি। মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা, আমরা তো সেই ভাষা বুঝি না, তবু একটুখানি স্বাদ নেওয়া যাক।

যক্ষের একটা প্রশ্ন ছিল, "সুখী কে?"

তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন:

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ

অনুনী চাপ্রবাসে চ স বারিচর মোদতে॥

দিবসাস্যাষ্টমে মানে হল, দিনের অষ্টম ভাগে, অর্থাৎ সন্ধেবেলা। শাকং পচতি যো নরঃ, মানে, যে মানুষ শাক রান্না করে। পরের লাইনের মানে, যার কোনও ঋণ নেই, আর যে বিদেশে থাকে না, তাকেই সুখী বলা যায়। অর্থাৎ, যে মানুষের কোনও ধারটার নেই, যে নিজের দেশে থেকে শুধু সন্ধেবেলা খানিকটা শাক রেঁধে খায়, সেই আসলে সুখী।

যুধিষ্ঠিরের সব ঠিকঠাক উত্তর শুনে খুশি হয়ে যক্ষ বললেন, "বেশ! বলো, তোমার ভাইদের কোন একজনকে তুমি বাঁচাতে চাও!"

যুধিষ্ঠির বললেন, "নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।"

এটা শুনে খুব অবাক হয়ে যক্ষ বললেন, "সে কী! ভীম তোমার সবচেয়ে প্রিয় ভাই, তা আমি জানি। আর অর্জুন তোমাদের বল-ভরসা। এদের বাদ দিয়ে তোমার সৎভাই নকুলকে বাঁচাতে চাইছ কেন?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আমি কখনও অধর্মের কাজ করতে পারি না। কুন্তী আর মাদ্রী আমাদের দুই মা। এই দুই মায়েরই অন্তত একটি করে সন্তান বেঁচে থাকুক, আমি তাই চাই!"

এবারে যক্ষ বললেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। আমিই ধর্ম, তোমার পিতা। তোমার চার ভাই-ই বেঁচে থাকবে। তোমাদের বনবাসের বারো বছর তো পূর্ণ হয়ে এল। এর পর এক

বছর তোমাদের অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা এই এক বছর ইচ্ছে মতো ছদ্মবেশে থাকতে পারবে।”

পাঁচ ভাই আশ্রমে ফিরে এসে ঋষি ও পুরোহিতদের প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, “এখন এক বছর আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তাই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে চাইছি।”

ঋষিরাও তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, “আবার নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে।”

এর পর পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী এক জায়গায় এসে পরামর্শ করতে লাগলেন, অজ্ঞাতবাসের বছরটা কোথায় কাটানো যায়। জঙ্গলে আর থাকা যাবে না, দুর্যোধনের দলবল ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে। কোনও নগরে গিয়ে অনেক লোকের মধ্যে মিশে থাকতে হবে। বেশ কয়েকটি রাজ্যের কথা আলোচনা করার পর যুধিষ্ঠির বললেন, “মৎস্যদেশটাই আমার পছন্দ। সে দেশের রাজা বিরাট ধার্মিক ও বৃদ্ধ, তাঁর অধীনে আমরা পরিচয় গোপন করে নিরাপদে থাকতে পারব।”

সেখানে কে, কী কাজ করবেন?

যুধিষ্ঠির বললেন, “আমি জানি, বিরাট রাজা পাশা খেলতে ভালবাসেন। আমি ব্রাহ্মণ সেজে তাঁর সভাসদ হব আর রাজার পাশা খেলায় সঙ্গী হব। আমার নাম হবে কঙ্ক।”

ভীম বললেন, "আমার নাম হবে বল্লভ, আমি রাজার রন্ধনশালার সব কিছু দেখাশোনার ভার নিতে চাইব। রান্না আমি ভালই জানি। তা ছাড়া আমি একসঙ্গে অনেক কাঠ বহন করে আনতে পারব, হাতি কিংবা বুনো মোষেরও উৎপাত হলে তাদের দমন করব অনায়াসে।"

আর অর্জুন? তাঁর এমন রূপবান চেহারা দেখেই তো অনেকে চিনে ফেলতে পারে। অর্জুন জানালেন যে, সেইজন্যই তিনি বৃহন্নলা নাম নিয়ে নপুংসক বা হিজড়ে সাজবেন। "মেয়েদের মতো পোশাক ও হাতে চুড়ি আর বালা পরব, রাজবাড়ির মেয়েদের নাচ-গান শেখাব। কেউ আমাকে চিনতে পারবে না।"

নকুল আর সহদেব বললেন, তাঁরা রাজার ঘোড়া ও গোরুর দেখাশোনার ভার নেবেন।

কিন্তু দ্রৌপদী কী কাজ করবেন? তিনি কত বড় রাজ্যের রাজকন্যা, পরম গুণবান, পঞ্চস্বামীর স্ত্রী, চিরকাল আদর-যত্নে মানুষ, তিনি কোনও দিনই তো অন্যের অধীনে থাকেননি?

দ্রৌপদী নিজেই বললেন, "হ্যাঁ, আমিও কাজ করতে পারব ঠিকই। আমি রানির চুল বেঁধে দেব, সাজিয়ে দেব, এ কাজ আমি ভালই পারব। আমার নাম হবে সৈরিন্ধ্রী।"

এর পর তাঁরা জঙ্গল ছেড়ে সোজাসুজি মৎস্যদেশে না গিয়ে অন্য দেশে ঘুরে-ঘুরে একসময় পৌঁছলেন মৎস্যদেশের সীমানায়। সবারই

গায়ের রং হয়ে গিয়েছে মলিন, পাঁচ ভাইয়ের মুখে দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাই লোকেদের নিজেদের ব্যাধ বলে পরিচয় দিতে-দিতে এসেছেন।

রাজধানীতে ঢুকে পড়ার আগে যুধিষ্ঠির বললেন, "এই সব অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে গেলে তো লোকে সন্দেহ করবে। আর অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু তো অনেকেই চেনে।" অর্জুন বললেন, "পাহাড়ের চুড়োয় একটা মস্ত বড় শমী গাছ দেখা যাচ্ছে, তার কোটরে এগুলো লুকিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না।" তখন সব তির-ধনুক, গদা, খড়্গ প্রভৃতি একসঙ্গে জড়ো করে লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হল, নকুল সেই গাছে উঠে সেই অস্ত্রের বোঝা এমন ভাবে বেঁধে রাখলেন যাতে সেগুলো বৃষ্টিতে না ভেজে। তারপর শ্মশান থেকে একটা মৃতদেহ নিয়ে এসে ঝুলিয়ে রাখলেন, যাতে দুর্গন্ধ বা ভয়ে কেউ গাছটার কাছেই না যায়।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সেই পাঁচজন বীরপুরুষ অতি সাধারণ মানুষের মতো প্রবেশ করলেন নগরে।

বিরাট রাজার সভায় এসে এঁরা যেরকম কাজ চেয়েছেন, পেয়ে গিয়েছেন সহজেই। যাঁরা ইচ্ছে করলেই পৃথিবী জয় করতে পারেন, তাঁরা এসব সামান্য কাজ মেনে নিতে দ্বিধা করলেন না।

কিছুদিনের মধ্যে রাজা সকলের কাজ দেখেই খুশি হলেন, রানিও

খুব ভালবাসলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তাঁর অমন গুণবান স্বামীদের এ রকম দীন দশা দেখে। কবে শেষ হবে অজ্ঞাতবাসের এক বছর?

কয়েক মাস কেটে যাবার পর রাজধানীতে একটা উৎসব শুরু হল। অনেক দেশ থেকে মল্লযোদ্ধারা অর্থাৎ কুস্তিগিররা এল লড়াই দেখতে। তাদের মধ্যে একজনের নাম জীমূত, এই নামের মানে মেঘ। তার পাহাড়ের মতো চেহারা, মেঘেরই মতো গায়ের রং। সে সবাইকে লড়াই করার জন্য ডাকতে লাগল। কেউ ভয়ে তার কাছে এগোল না।

রাজা তখন ভীমকে ডেকে বললেন, "ওহে বল্লভ, তুমি লড়াই করো।"

অকারণে কারও সঙ্গে লড়াই করার একটুও ইচ্ছে নেই ভীমের। কিন্তু এখন চাকরি করছেন, রাজার আদেশ মানতেই হবে। তিনি সেখানে এসে দাঁড়াতেই জীমূত হিংস্র গর্জন করে উঠল। মাত্র একটুক্ষণের লড়াইয়েই ভীম তাঁকে এত জোরে তুলে আছাড় মারলেন যে, সে আর উঠতেই পারল না।

রাজা খুশি হয়ে ভীমকে অনেক উপহার দিলেন, তাও হাত পেতে নিতে হল ভীমকে।

যুধিষ্ঠিরকে রাজা এর মধ্যেই বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন, প্রায়

প্রতিদিনই দু'জনে পাশা খেলতে বসেন। অর্জুন, নকুল, সহদেবের কাজেও সবাই খুশি। এইভাবে কেটে গেল দশটা মাস, তার পরই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

দ্রৌপদী প্রতি সন্ধেবেলা রানি সুদেষ্ণার চুল বেঁধে তাঁকে নানান ভাবে সাজিয়ে দেন। একদিন সেখানে রানির ভাই এসে উপস্থিত। লোকটা মোটেই ভাল নয়। নানারকম অত্যাচার করে, কিন্তু সে রানির ভাই বলে কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সে আবার রাজ্যের সেনাপতিও বটে। দ্রৌপদীর মতো এক অপরূপ সুন্দরীকে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ। তক্ষুনি তাকে বিয়ে করতে চাইল। সে বলল, "তুমি কেন সামান্য পরিচারিকা হয়ে থাকবে, আমার বাড়িতে এসে তুমি কর্তৃত্ব নিয়ে থাকো।"

দ্রৌপদী জানালেন যে, তাঁর আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁর স্বামী থাকেন বিদেশে। রানির ভাই কীচক সে কথা গ্রাহ্যই করল না। সে দিনের পর-দিন একই কথা বলে জোরাজুরি করতে লাগল। একদিন সে জোর করে দ্রৌপদীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দ্রৌপদী তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে চলে এলেন রাজসভায়। সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীমও তখন উপস্থিত। দ্রৌপদী তাঁদের কিছু জানাবার আগেই কীচকও চলে এল। এত লোকের সামনেই সে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে

লাথি মারল কয়েকবার। তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

দ্রৌপদীকে এ রকম ভাবে অপমানিত হতে দেখে ভীম রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষে উঠে দাঁড়াতে যেতেই যুধিষ্ঠির একটা আঙুলের খোঁচায় তাঁকে থামালেন। এই সময় ভীম কিছু করতে গেলেই তাঁদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যেতে পারে। আর কৌরবরা যদি কোনও রকমে জেনে যায়, তা হলেই শর্ত অনুযায়ী তাঁদের আরও বারো বছর বনে-জঙ্গলে কাটাতে হবে। কাঁদতে-কাঁদতে দ্রৌপদী সবার কাছে সুবিচার চাইলেন। রাজা কিংবা অন্য কেউ কীচককে শাস্তি দেবার কোনও কথা বললেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, "সৈরিন্ধ্রী, তুমি এখন রানি সুদেষ্ণার কাছে আশ্রয় নাও। রাজসভায় কান্নাকাটি করা তোমায় মানায় না।"

দ্রৌপদী নিজের ঘরে এসে স্নান করলেন, তবু তাঁর অপমানের ব্যথা কিংবা রাগ কমল না। একসময় তাঁর মনে হল, একমাত্র ভীম ছাড়া আর কারও উপরই ভরসা করা যায় না। অর্জুন বৃহন্নলা হয়ে মেয়েমহলে নাচ-গান নিয়ে ব্যস্ত, নকুল-সহদেব ঘোড়া ও গোরুর পরিচর্যা করে যাচ্ছেন। আর যুধিষ্ঠির সব সময়ই দুর্বল, তাঁর দোষেই তো এত কিছু ঘটেছে।

তিনি সন্ধের পর ভীমের ঘরে গিয়ে বললেন, "আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, আমি আত্মঘাতী হব! কৌরবসভায় দুঃশাসন

আমাকে দাসী বলেছিল, সে অপমান আমার মনে এখনও দগদগে হয়ে আছে। জয়দ্রথ একবার আমার চুল ধরে টেনেছিল, আর আজ কীচক এত লোকের সামনে আমাকে চুলের মুঠি ধরে লাথি মেরেছে। আমি দ্রুপদ রাজার মেয়ে, পাণ্ডবদের স্ত্রী, তবু আমাকে আর কত অপমান সইতে হবে? বাড়ির ঝিয়ের মতো এখানকার সবার জন্য আমাকে খাটতে হয়, চন্দন বাটতে-বাটতে আমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছে...”

ভীমের চোখেও জল এসে গেল। তিনি বললেন, “ধিক আমার বাহুবল! ধিক অর্জুনের গাণ্ডীব। আজ সভার মধ্যে কীচকের কাণ্ড দেখে তখনই তার মাথাটা ভেঙে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল আমার, কিন্তু বড়ভাই আমাকে নিষেধ করলেন। যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদীর আর-এক নাম), তুমি আর পনেরোটি দিন অপেক্ষা করো, তারপরই তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।”

দ্রৌপদী বললেন, “তোমরা থাকো তোমাদের অজ্ঞাতবাসের ভাবনা নিয়ে। কালকের মধ্যে কীচককে যদি কেউ চরম শাস্তি না দেয়, তা হলে আমি নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করব।”

ভীম বললেন, “তা হলে শোনো। কীচককে আমি শাস্তি দেব ঠিকই, কিন্তু গোপনে। এখানে যে নৃত্যশালা আছে, সেটা সন্ধের পর ফাঁকা থাকে। বাতিও জ্বলে না। তুমি কীচককে খবর পাঠাও, তুমি

তার জন্য কাল সন্ধের সময় সেখানে অপেক্ষা করবে। তারপর দেখো কী হয়।”

কীচককে খবর দিতে হল না, সকালে সে নিজেই এল দ্রৌপদীর কাছে। সদম্ভে বলল, “আমি রাজসভায় রাজার সামনেই তোমাকে পদাঘাত করলাম, তবু কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেছে কি? আমি সেনাপতি হলেও আসলে আমিই রাজা। এবার বুঝলে তো, আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার আর বাঁচার পথ নেই। আমার বাড়ি চলো, তুমি সেখানে মহাসুখে থাকবে।”

দ্রৌপদী বললেন, “অমি সব বুঝি। কিন্তু এখন তো আমি কাজে যাচ্ছি, আপনি সন্ধের পর নৃত্যশালায় আসুন, সেখানে সব কথা হবে। আর কেউ যেন সঙ্গে না আসে।”

কীচক মহানন্দে সেজেগুজে সন্ধেবেলা হাজির হল নৃত্যশালায়। গিয়ে দেখল অন্ধকারের মধ্যে কে যেন শুয়ে আছে। তাকে দ্রৌপদী মনে করে ছুঁতে গিয়েছে, অমনি উঠে বসলেন ভীম। তিনি বললেন, “পাপিষ্ঠ, আজই তোমার শেষ দিন।”

শুরু হল দু’জনের লড়াই। কীচকও বেশ বলশালী। বাহুযুদ্ধও জানে, কিন্তু ভীমের সঙ্গে এঁটে উঠবে, এমন সাধ্য কার আছে? একটুক্ষণের মধ্যে দু’ হাতে গলা চেপে ধরে কীচককে তুলে ঘোরাতে লাগলেন ভীম। তাতেই কীচক শেষ। এর পরেও ভীমের রাগ মিটল না।

তিনি কীচকের হাত-পা ভেঙে ঢুকিয়ে দিলেন তার শরীরের মধ্যে। এইভাবে কীচক বধ সমাপ্ত করে ভীম দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

এদিকে কৌরবরা চতুর্দিকে তন্নতন্ন করে খুঁজছিলেন পাণ্ডবদের। এই অজ্ঞাতবাসের মধ্যে তাঁদের সন্ধান পেলে তাঁদের আবার বনবাসে পাঠানো যাবে, কিন্তু কিছুতেই পাণ্ডবদের হদিশ তাঁরা পেলেন না। এর মধ্যে কীচকের মৃত্যুর খবরও ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্যোধন আর তাঁর সঙ্গীরা ঠিক করলেন যে, এই সময় মৎস্যরাজ্যটা অনায়াসেই জয় করে ফেলা যায়। বিরাট রাজা নিতান্ত বৃদ্ধ, তাঁদের রাজ্যে যুদ্ধ করার মতো তেমন বীর আর কেউ নেই।

কৌরবরা একদিন অতর্কিতে আক্রমণ করলেন মৎস্যরাজ্য। আর ঠিক সেদিনই পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

পাণ্ডবরা যে রাজ্যে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, সেই রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন কীচক। সবাই তাঁকে খুব বড় বীর যোদ্ধা মনে করত। তিনি তো মারা গিয়েছেন, এখন কোনও দেশ যদি এই রাজ্য আক্রমণ করে, তা হলে বৃদ্ধ বিরাট রাজা নিশ্চয়ই হেরে যাবেন। তাই কৌরবরা বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে মৎস্যরাজ্য জয় করার জন্য ধেয়ে এলেন।

বিরাট রাজা যথাসাধ্য লড়াই করতে গেলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না, ফিরে এলেন রাজধানীতে। কৌরবরা যেমন ইচ্ছে লুটপাট চালাতে লাগলেন। এদেশের রাজপুত্রের নাম উত্তর, তিনি খুব গর্ব করে বলতে লাগলেন, "আমি ইচ্ছে করলেই ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন সবাইকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার রথের কোনও সারথি নেই, একজন ভাল সারথি পেলে আমি দেখিয়ে দিতাম!"
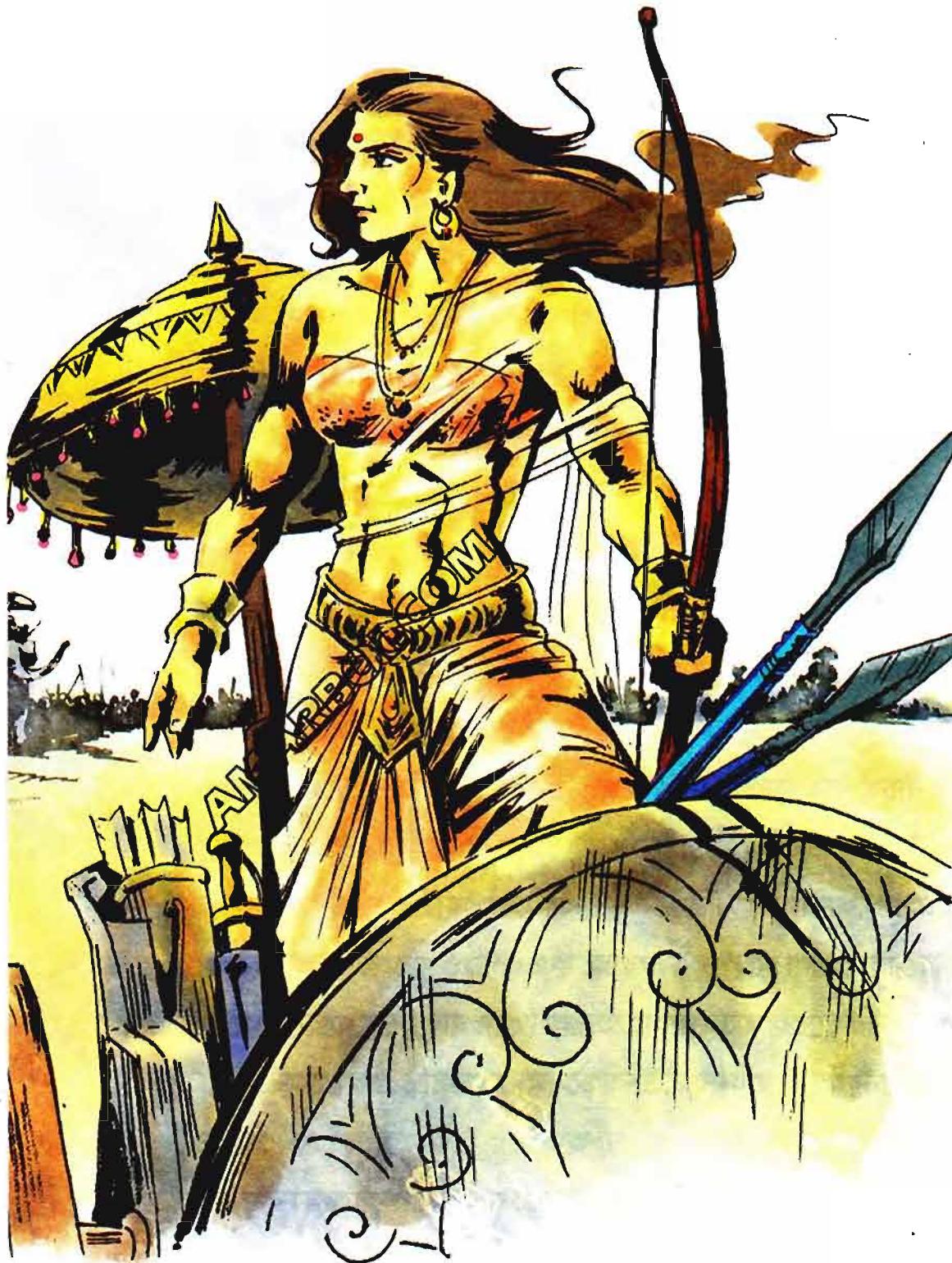
তা শুনে দ্রৌপদী জানালেন যে, বৃহন্নলা নামে যে-লোকটি নাচ-

গান শেখান, তিনি ভাল রথ চালাতেও জানেন। রাজকুমার তখন তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যুদ্ধযাত্রায়।

তারপর বৃহন্নলা তো খুব জোরে চালিয়ে দিলেন রথ। কিছু দূর গিয়ে দেখা গেল, বিরাট সমুদ্রের মতো অসংখ্য কৌরব সৈন্য, তার মধ্যে বড়-বড় বীরদের বিশাল-বিশাল রথ। তা দেখেই উত্তরের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন, "সারথি তুমি রথ ঘোরাও, আমি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না।"

বৃহন্নলা বললেন, "সে কী রাজকুমার! তুমি খানিক আগেই রাজসভায় দাঁড়িয়ে কত আস্ফালন করেছিলে, এখন ফিরে যেতে চাইছ? এটা তোমাকে মানায় না।"

উত্তর বললেন, "ওরে বাবা রে, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে আমি বাঁচব না। আগে তো নিজের প্রাণ! তুমি ফিরে চলো, ফিরে চলো।"

বৃহন্নলা বললেন, "ক্ষত্রিয়দের এ রকম ব্যবহার করতে নেই। যুদ্ধ শুরু করেই দ্যাখো না!"

বৃহন্নলা কিছুতেই রথ ঘোরাতে রাজি হচ্ছেন না দেখে রাজকুমার লাফিয়ে নেমে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। বৃহন্নলাও রথ ছেড়ে তাড়া করতে লাগলেন তাঁকে।

অর্জুন তো বৃহন্নলা হয়ে মেয়েদের মতো সাজ করে আছেন। কাঁচুলি

আর ঘাগরা পরা, চুলে লম্বা বেণী। সেরকম একজন রাজকুমারকে তাড়া করছেন দেখে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা হাহা-হিহি করে হাসতে লাগল।

একশো পা দৌড়ে গিয়ে অর্জুন রাজকুমারের চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

রাজকুমার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "বৃহন্নলা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাঁচতে চাই। আমি তোমাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা, মণিমাণিক্য, রথ আরও অনেক কিছু দেব, তুমি আমাকে রাজধানীতে ফেরত নিয়ে যাও।"

অর্জুন তাঁকে টানতে-টানতে রথের কাছে নিয়ে এসে বললেন, "তুমি যখন পারবে না, তখন আমি নিজেই যুদ্ধ করব। তুমি এখন রথ চালাও।"

রাজকুমার বাধ্য হয়ে সারথির আসনে বসে অর্জুনের নির্দেশ মতো রথটা নিয়ে এলেন একটা শমী গাছের কাছে। অর্জুন বললেন, "তুমি এই গাছের উপরে ওঠো, এক জায়গায় দেখবে পাতার আড়ালে অনেক অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে, সেগুলো নামিয়ে আনো।"

রাজকুমার সেই বিরাট বোঝাটা নামিয়ে আনার পর অত দারুণ-দারুণ অস্ত্র দেখে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক, "এই সব অস্ত্র কাদের?"

অর্জুন বললেন, "পাণ্ডবদের।"

রাজকুমার জানতে চাইলেন, "পাণ্ডবরা কোথায়?"

অর্জুন তখন স্মিত হাস্যে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর অন্য চার ভাই ও দ্রৌপদী যে কোন ছদ্মবেশে আছেন তাও জানালেন।

মেয়েদের মতো সাজ, নাচ-গান শেখায়, তিনিই মহাবীর অর্জুন? প্রথমে তো বিশ্বাসই হতে চায় না। তারপর আরও একটুক্ষণ কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরে তিনি অর্জুনকে অভিবাদন করে বললেন, "আপনার দেখা পেয়েছি, আমি ধন্য। না-জেনে আপনাকে খারাপ কথা বলেছি, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

অর্জুন যুদ্ধের সাজ-পোশাক পরে নিয়ে তাঁর গাণ্ডীব ধনুতে টংকার দিলেন। সেই বজ্রের মতো শব্দ শুনে কৌরবপক্ষের সবাই বুঝে গেলেন, ইনি তো অর্জুন ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

অনেকে ভয় পেলেও দুর্যোধন আনন্দের সঙ্গে বললেন, "বাঃ, তা হলে তো বেশ হল। চুক্তি ছিল যে পাণ্ডবরা বারো বছর বনবাস করবে, তারপর এক বছর অজ্ঞাতবাস। সেই অজ্ঞাতবাসের সময় না-ফুরোতেই ওরা ধরা পড়ে গেল। এবার ওদের আবার বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।"

তখন ভীষ্ম গণনা করে দেখে বললেন, "না, পাণ্ডবরা ধরা পড়েনি, ওদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গিয়েছে। অর্জুন তা দেখেশুনেই আত্মপ্রকাশ করেছে।"

দুর্যোধন বললেন, “আসুক না অর্জুন। আমরা যুদ্ধ করে ওদের এখানেই শেষ করে দেব।”

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।

এক দিকে অর্জুন, অন্য দিকে ভীম প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করলেন কৌরবদের। অনেক দিন এঁরা যদিও যুদ্ধ করেননি। কিন্তু অপমানের জ্বালায় এমন জ্বলছেন যে, তাঁদের তেজের সামনে কৌরবপক্ষের বড়-বড় যোদ্ধারাও দাঁড়াতে পারছেন না। সেই ভয়ংকর যুদ্ধ দেখে রাজকুমার উত্তর ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

একসময় অর্জুন সম্মোহন নামে এমন একটা বাণ ছুড়লেন, যাতে ভীষ্ম ছাড়া অন্য সব কৌরবপক্ষের বীরেরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন অর্জুন রাজকুমারকে বললেন, “তুমি ভীষ্মকে এড়িয়ে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের উপরের জামাগুলো খুলে নিয়ে এসো। ততক্ষণ আমি ভীষ্মকে সামলাচ্ছি।”

উত্তর দৌড়ে গিয়ে সকলের জামাগুলো খুলে নিয়ে এলেন।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দুর্যোধন দারুণ রেগে গিয়ে ভীষ্মের কাছে এসে বললেন, “পিতামহ, আপনি যেমন করে পারেন, অর্জুনকে আটকে রাখুন।”

ভীষ্ম হেসে বললেন, “তুমি এখন এই কথা বলছ! তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলে, তখন অর্জুন তো তোমাকে মেরে ফেলতেই পারত।

সেরকম কিছুই করেনি। এখন শুধু-শুধু অর্জুনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কী লাভ? বরং এখন ফিরে চলো। ফিরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের খবর জানাও।”

কৌরবপক্ষের অন্য বীররাও ভীষ্মকে সমর্থন করলেন।

কৌরবসৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে দেখে এ রাজ্যের সৈন্যরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

অর্জুন রাজকুমারকে বললেন, “তুমি রাজধানীতে গিয়ে আগেই তোমার বাবার কাছে আমাদের পরিচয় দিও না। আস্তে-আস্তে জানাতে হবে। তুমি খবর পাঠাও যে তুমি নিজেই এই যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ!”

দূতের মুখে এই সংবাদ শুনে বিরাট রাজার আনন্দের অবধি রইল না। সবাইকে ডেকে-ডেকে ছেলের বীরত্বের কথা শোনাতে লাগলেন। সবাইকে আদেশ দিলেন রাজধানী আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজাতে। রাজকুমার কখন ফিরবেন সেই অপেক্ষায় অধীর হয়ে তিনি কঙ্কের সঙ্গে পাশা খেলতে বসলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন, “শুনেছ আমার ছেলের কথা। সে কত বড় বীর! কৌরবদের সবাই ভয় পায়, কৌরবদেরও সে তাড়িয়ে দিয়েছে।”

কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির তো সবই বুঝলেন। তিনি একবার বলে ফেললেন, “বৃহন্নলা যার রথের সারথি, সে তো জিতবেই!”

তা শুনে বিরাট রাজা খুব রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি তো অতি বাজে লোক! তুমি আমার ছেলের বীরত্বের কথা গ্রাহ্য না করে বৃহন্নলার প্রশংসা করছ? মুখ সামলে থাকো।"

একটু পরে বিরাট রাজা আবার তাঁর ছেলের নামে গর্ব করতেই যুধিষ্ঠির আবার বলে ফেললেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের সঙ্গে বৃহন্নলা ছাড়া কেউ এই যুদ্ধ করতে পারে?"

এবার বিরাট রাজা আরও রেগে গিয়ে বললেন, "কী, তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? এখনও বৃহন্নলার প্রশংসা!"

তিনি হাতের একটা পাশা ছুড়ে মারলেন যুধিষ্ঠিরের মুখে। তাঁর নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। আড়াল থেকে দ্রৌপদী তা দেখেই একটা পাত্র নিয়ে দৌড়ে এসে যুধিষ্ঠিরের নাকের কাছে ধরলেন।

ওদিকে অর্জুন সেই শমী গাছটার কাছে গিয়ে অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখলেন। তারপর যুদ্ধের পোশাক খুলে আবার পরে নিলেন বৃহন্নলার বেশ। তারপর রাজকুমারকে রথে বসিয়ে নিজে সারথি হয়ে ফিরে এলেন রাজধানীতে। কৌরবদের পোশাকগুলো রাজবাড়ির মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে দেখা করতে গেলেন রাজার সঙ্গে।

দ্বারপাল যখন এসে খবর দিল যে, ওই দু'জন আসছেন দেখা করতে, তখন যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বৃহন্নলাকে এখন
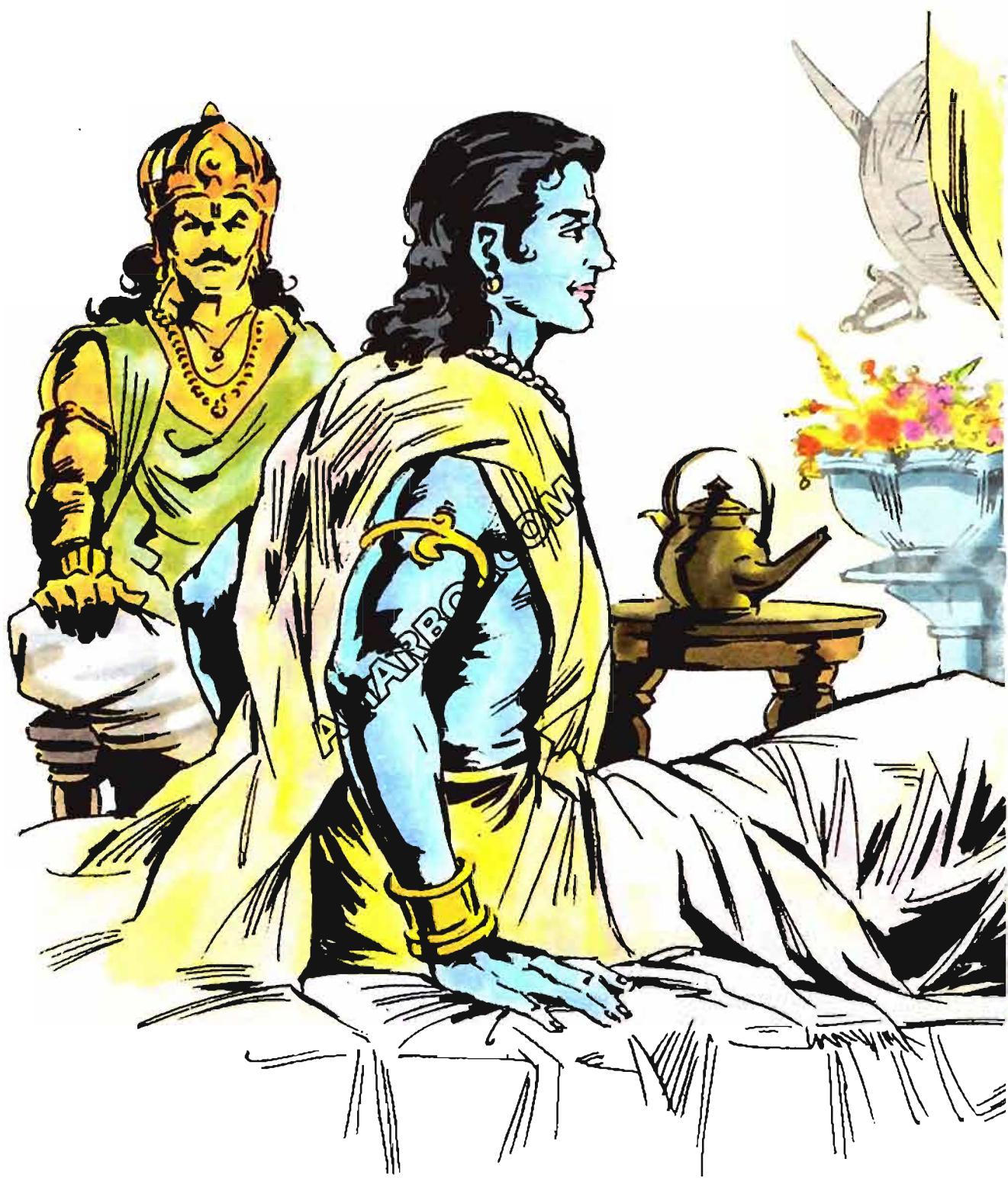
দেখা করতে বারণ করো! তার আসার দরকার নেই!”

যুধিষ্ঠিরকে আহত অবস্থায় দেখলে অর্জুন নিশ্চয়ই রেগে গিয়ে বিরাট রাজার পুরো রাজ্যটা ধ্বংস করে দিতেন, রাজকুমার উত্তর সেখানে এসে বাবাকে প্রণাম করার পর যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে তাঁর রক্তাক্ত মুখ দেখে আঁতকে উঠে বললেন, “এ কী? এঁর এই অবস্থা হল কী করে?”

বিরাট রাজা বললেন, “এ লোকটার এত স্পর্ধা, তোমার বদলে বৃহন্নলার প্রশংসা করছিল। একে শাস্তি দেওয়া উচিত।”

রাজকুমার বললেন, “সর্বনাশ! বাবা, উনি ইচ্ছে করলে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। শিগগির এঁর কাছে ক্ষমা চাও।”

রাজা বিরাট ঘাবড়ে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে যুধিষ্ঠির বললেন, “আমার রাগ নেই, আমি আপনাকে আগেই ক্ষমা করেছি।”

এর দু’-তিন দিনের মধ্যেই পাণ্ডবদের পরিচয় সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেল। সারা রাজ্য জুড়ে চলল উৎসব। পাণ্ডবরা ছদ্মবেশ ছেড়ে রাজপোশাক পরে বসলেন রাজসভায়।

সেখানেই রাজ্যের রাজকন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কৃষ্ণ, বলরাম, আরও অনেকে সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদীর বাপের বাড়ি থেকেও

এলেন আত্মীয়-স্বজনরা, খুব ধুমধাম করে হল বিয়ের অনুষ্ঠান।

এত বছর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর এখন পাণ্ডবদের সুখের দিন। পাণ্ডবরা সব শর্ত মেনেছেন। বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাসে ঠিকঠাক কাটিয়েছেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় যে রাজ্য হারিয়েছিলেন, তা তো এখন ফিরে পাওয়ার কথা। কিন্তু গুপ্তচরদের মুখে, আরও নানা সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, দুর্যোধন নাকি কিছুতেই রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি নন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এমনকী, বাবার কথাও শুনছেন না দুর্যোধন। এরই মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁদের সমর্থন চাইছেন।

শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চান না। মহাবীর অর্জুনও যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। কিন্তু প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে কৌরবরা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, সেজন্যও তো তৈরি থাকা দরকার। পাণ্ডবরাও দূত পাঠালেন অনেক রাজ্যে। তখন দেখা গেল, সারা ভারতের বেশ কিছু রাজা কৌরবপক্ষে যোগ দিতে চান, আর অনেক রাজা সমর্থন করেন পাণ্ডবদের। দেশটাই দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

কৃষ্ণ যাবেন কোন পক্ষে?

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মামাতো ভাই। আবার কৃষ্ণের এক ছেলে শাম্ব দুর্যোধনের মেয়েকে বিয়ে করেছে। দু' পক্ষেই তাঁর আত্মীয় আর কুটুম্ব।

অর্জুন একা চলে গেলেন দ্বারকায়। দুর্যোধনও একই উদ্দেশ্যে একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছেন সেখানে। কৃষ্ণ তখন ঘুমোচ্ছেন। দুর্যোধন রাজার মতো বসে রইলেন কৃষ্ণের মাথার কাছে উচ্চ আসনে। আর অর্জুন বসলেন কৃষ্ণের পায়ের কাছে।

কৃষ্ণ চোখ মেলে দু'জনকে দেখার পর জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? তোমরা দু'জনেই এখানে উপস্থিত কী জন্য?"

দুর্যোধন হেসে বললেন, "কারণটা তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ। আমি চাই, তুমি আমাদের পক্ষে যোগ দাও। জানি, আমার আর অর্জুনের সঙ্গে তোমার সমান সম্পর্ক, কিন্তু আমিই আগে এসেছি। যে আগে আসে, তার অনুরোধই তো আগে রাখতে হয়।"

কৃষ্ণ বললেন, "দুর্যোধন, তুমি যা বললে, তা ঠিক। তুমিই আগে এসেছ। কিন্তু আমি চোখ মেলে অর্জুনকেই আগে দেখেছি। আমি দু'জনকেই সাহায্য করতে চাই। এক পক্ষে থাকবে আমার প্রায় দশ কোটি নারায়ণী সেনা। তারা সাংঘাতিক যোদ্ধা। অন্য পক্ষে শুধু একা আমি, কিন্তু আমি যুদ্ধ করব না, শুধু পরামর্শ দিতে পারি। অর্জুন তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, সেই জন্য তাকেই আগে বেছে নিতে দাও।"

অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "আমি শুধু তোমাকেই চাই।"

দুর্যোধন দশ কোটি সৈন্য পেয়ে খুব খুশি। কৃষ্ণ তো যুদ্ধ করবেনই না বলেছেন।

এর পর বলরামের কাছে যাওয়া হল। তিনি বললেন, তিনি কোনও পক্ষেই যোগ দিতে চান না।

যুদ্ধ কি তা হলে সত্যিই লাগবে? কোনও রকমেই আটকানো যায় না? শেষ চেষ্টা হিসেবে কৃষ্ণকে কৌরবসভায় পাঠাবার প্রস্তাব হল।

যুধিষ্ঠির এখনও যুদ্ধ চান না। এমনকী, পুরো রাজ্যের বদলে দুর্যোধন যদি তাঁদের পাঁচখানা মাত্র গ্রাম দিতে রাজি থাকেন, তাও তিনি মেনে নেবেন। অর্জুনও যুদ্ধ না হওয়াটাই ভাল মনে করেন। এমনকী, ভীমও বলে ফেললেন যে, কৌরবরা ও পাণ্ডবরা তো একই বংশ, যুদ্ধে দু' পক্ষেরই বিনাশ হবে। তার চেয়ে শান্তির সপক্ষে সন্ধি করাই তো ভাল!

দ্রৌপদী কাঁদতে-কাঁদতে কৃষ্ণকে বললেন, "মধুসূদন, তুমি তো সবই জানো। ধিক অর্জুনের বীরত্ব আর ভীমসেনের শক্তি! তাঁরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ভুলে গিয়েছেন? কৌরবসভায় আমার কী অপমান হয়েছিল, দুঃশাসন আমার চুল টেনেছিল, আমি তখন তোমাকে স্মরণ করেছিলাম। আমার স্বামীরা এখন প্রতিশোধ নেবার বদলে ধর্মের কথা বলছেন।"

॥ ৯ ॥

দ্রৌপদীকে অঝোরে কাঁদতে দেখে কৃষ্ণ বললেন, "দ্রৌপদী, আমি কৌরবদের কাছে যাচ্ছি। দুর্যোধনরা যদি আমার কথা না শোনে, তা হলে তারা যুদ্ধে নিহত হয়ে শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হবে। হিমালয় যদি কেঁপে ওঠে, পৃথিবী যদি শত টুকরো হয়ে যায়, নক্ষত্রসমেত আকাশও ভেঙে পড়ে, তবু আমার কথা ব্যর্থ হবে না। যাজ্ঞসেনী, তুমি আর অশ্রুবর্ষণ কোরো না।"

সদলবলে কৃষ্ণ এলেন হস্তিনাপুরে। প্রথমে গিয়ে প্রণাম করলেন পাণ্ডবদের মা কুন্তীকে, তারপর গেলেন বিদুরের বাড়িতে।

কৃষ্ণ আসবেন বলে সমস্ত রাস্তাঘাট ও রাজসভা সাজানো হয়েছে বিশেষ ভাবে, কৃষ্ণের জন্য রাখা হয়েছে একটি সোনায় মোড়া আসন। কৃষ্ণ যখন সেখানে প্রবেশ করলেন, তখন কৌরবপক্ষের সবাই সেখানে উপস্থিত, আরও রয়েছেন বহু দেশের রাজা-রাজপুত্রেরা। সবাই উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য।

কৃষ্ণকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন।

কৃষ্ণও সকলকে সম্মান জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "মহারাজ, কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যাতে শান্তি হয়, আমি সেই প্রার্থনা জানাতে এসেছি। আপনাদের কত বড় বংশ, কোনও অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত নয়। আপনার ছেলেদের শাসন করুন। দু' পক্ষে যদি সন্ধি হয়, তা হলে এ রাজ্য এত শক্তিশালী হবে যে, পৃথিবীর আর কোনও দেশ আপনাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। এই পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের মতো বীর যোদ্ধারা আছেন, ওঁদের সঙ্গে যদি অর্জুন, ভীম আর পাণ্ডবপক্ষের সবাই যোগ দেন, তা হলে দেবতারাও এঁদের হারাতে পারবেন না। আর যদি এই দু'পক্ষের যুদ্ধ লাগে, তা হলে হয় পাণ্ডবরা কিংবা আপনার লোকেরা নিহত হবেন, তাতে কী লাভ হবে আপনার? আরও কত রাজা ও সৈন্যরা দু' পক্ষে থাকবে, তাদের প্রায় সবাই মরবে। এত মানুষের জীবন নষ্ট করা কি আপনার কাম্য হতে পারে? আপনি শান্তি চাইলে এই রাজারাও নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন। আপনার ছেলেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করেছে, পাণ্ডবরা কিন্তু তার কোনও প্রতিশোধ নেয়নি। আপনার আদেশে তারা বারো বছরের বনবাসে গিয়েছে, তারপর এক বছর অজ্ঞাতবাসও ঠিক-ঠিক পালন করেছে। এখন আপনি তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন।"

একটু থেমে কৃষ্ণ আবার বললেন, "পাণ্ডবরাও আপনার সন্তানের মতো। আপনার কাছেই তারা পালিত হয়েছে। আপনি চাইলে এখনও তারা আপনার সেবা করতে পারে। অথবা তারা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। এখন কীসে মঙ্গল হবে, তা আপনি বেছে নিন।"

রাজসভায় সবাই মনে করলেন, কৃষ্ণ ঠিক কথাই বলছেন।

ধৃতরাষ্ট্র অসহায় গলায় বললেন, "কৃষ্ণ, তুমি যা বললে, তাই ধর্মসংগত ও ন্যায্য। কিন্তু আমার ছেলেরা আর আমাকে মানে না। গান্ধারী, ভীষ্ম, বিদুরের উপদেশও দুর্যোধন গ্রাহ্য করে না। তুমি ওকে বোঝাও।"

কৃষ্ণ তখন দুর্যোধনকে বললেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার অনেক গুণ আছে। তুমি শাস্ত্রও জানো। এখন যেটা ন্যায়সম্মত, সেটাই করো। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে বাল্যকাল থেকে অন্যায় ব্যবহার করেছ, তারা সব সহ্য করেছে। যুধিষ্ঠির সবাইকে ক্ষমা করে দেয়। এখন দু' পক্ষে মিলেমিশে থাকতে পারো না? তুমি যদি যুদ্ধ চাও, তা হলে অর্জুনকে জয় করতে পারবে? দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষরাও অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে পারে না, কোন মানুষ তার সমকক্ষ হবে? তোমার জন্য কৌরবরা ধ্বংস হোক, তুমি তাই চাও? এখনও বলছি, তুমি দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করো। পাণ্ডবরা তো ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ আর তোমাকে যুবরাজ বলে মেনে নেবে। তুমি শুধু তাদের রাজ্যের ভাগ দিয়ে দাও। তাতে সকলের শান্তি হোক।"

ভীষ্মও দুর্যোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাতে কর্ণপাত না করে উঠে দাঁড়িয়ে অভিমানের সঙ্গে বললেন, “তোমরা সবাই শুধু আমারই নিন্দে করো, পাণ্ডবদের কোনও দোষ দ্যাখো না। পাণ্ডবরা জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে বনবাসে গিয়েছে, তাতে আমার কী দোষ? আমাকে যুদ্ধের ভয় দেখিও না। আমাদের দলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের মতো মহারথীরা রয়েছেন, এঁদের হারাবার সাধ্য কোনও মানুষেরই নেই। আর যুদ্ধক্ষেত্রে যদি মৃত্যুবরণও করি, সেটাও হবে গৌরবের। শোনো কৃষ্ণ, বাবা বলেছিলেন, পাণ্ডবরা তেরো বছর পর ফিরে এলে পাণ্ডবদেব রাজ্যও ফিরিয়ে দেবেন। তখন আমার বয়স কম ছিল, আমি এ শর্ত মেনে নিয়েছিলাম। এখন আর আমি ওসব মানি না। আমি ওদের কিছু দেব না। এমনকী, সূচ্যগ্র মেদিনীও দিতে রাজি নই।” (সূচ্যগ্র মেদিনী মানে, একটা ছুঁচের ডগায় যেটুকু মাটি ওঠে, সেইটুকু।)

রাগে কৃষ্ণের চোখ দু’টো জ্বলে উঠল, তবু তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, “পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে তুমি হিংসেয় জ্বলে জুয়া খেলার আসর বসিয়ে ওদের হারিয়েছ? তুমি ছাড়া আর কে নিজের ভাইয়ের স্ত্রীকে রাজসভায় এনে অপমান করতে পারে? তুমি, দুঃশাসন আর কর্ণ মিলে কত কুকথা বলেছ তাকে। তুমি জতুগৃহ তৈরি করে কুন্তী আর পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলে, তবু তুমি বলছ,

তোমার কোনও দোষ নেই? পাণ্ডবরা নিজেদের বাবার অংশই চাইছেন, তাও তুমি ফিরিয়ে দিতে রাজি নও, তুমি অত্যন্ত পাপী। ঠিক আছে, তুমি যা চাও তাই হবে, শেষ পর্যন্ত সব কিছু হারিয়ে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রেই শুয়ে থাকতে হবে।"

আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদ হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি বা সন্ধির কোনও আশা দেখা গেল না। বোঝা গেল, যুদ্ধ হবেই হবে। কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে।

ফেরার পর কৃষ্ণ দেখলেন, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন কর্ণ। কৃষ্ণ তাঁকে তুলে নিলেন রথে। তারপর দু'জনে গিয়ে বসলেন নির্জন জায়গায়।

কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, "তোমাকে একটা কথা জানাই। তুমি কুন্তীর গর্ভের সন্তান অর্থাৎ তুমি একজন পাণ্ডব। তুমি আজ আমার সঙ্গে চলো, পাণ্ডবরা জানুক যে তুমি তাদের বড় ভাই। তা জানলেই তোমরা পাঁচ ভাই, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে ও অভিমন্যুরা সবাই তোমার চরণবন্দনা করবে। দ্রৌপদীও হবে তোমার স্ত্রী। তুমি হবে পৃথিবীর রাজা। যুধিষ্ঠির হবে যুবরাজ, সে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে মাথায় চামর দোলাবে, ভীমসেন ছাতা মেলে ধরবে তোমার জন্য, অর্জুন তোমার রথ চালাবে, আর সবাই থাকবে তোমার সঙ্গে। কুন্তীপুত্র, তুমি পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে মিলে রাজ্য শাসন করো, কুন্তীও তোমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হবেন।"

কর্ণ অন্য অনেক সময় চঞ্চল হয়ে থাকেন, কটু কথা বলেন। এখন তিনি শান্ত ও গম্ভীর। ধীর গলায় বললেন, "কৃষ্ণ, তুমি যা বললে, তা আমি জেনেছি। সূর্যদেব আমার পিতা, কুন্তী আমার মা। আমার জন্মের পরেই মা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অধিরথ নামে এক সূত আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী আমাকে তাঁর বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছেন। ওঁদেরই আমি বাবা-মা বলে শৈশব থেকে জেনেছি। সবাই আমাকে সূতপুত্র বলে জানে, সূতবংশের মেয়েদেরই আমি বিয়ে করেছি। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবী আর রাশি-রাশি ঐশ্বর্য পেলেও আমি এঁদের ত্যাগ করতে পারব না। লোভেও না, ভয়েও না। দুর্যোধন বরাবর আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছে, আমার ভরসাতেই সে অনেকটা যুদ্ধের জন্য উৎসাহী। সে ভাবে, আমিই অর্জুনকে হারাব। এখন আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারি? কোনও প্রলোভনেই আমি এত অকৃতজ্ঞ হতে পারব না। তবে তুমি আমাদের আলোচনা গোপন রেখো। যুধিষ্ঠির যদি জেনে ফেলেন যে, আমিও তাঁর অগ্রজ, তা হলে তিনি আর রাজ্য নিতে চাইবেন না। আমাকে দিতে চাইলেও তো আমি তা নেব না, দুর্যোধনকে দিয়ে দেব।"

কৃষ্ণ বললেন "কর্ণ, আমি তোমাকে পৃথিবীর দায়িত্ব দিতে চাইলাম, তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবেই। দুর্যোধন আর তার দলের সবাই নিহত হবে।"

কর্ণ বললেন, "তুমি সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাইছ? আমি তো জানিই যে পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন। দুর্যোধনরা আর আমি তার নিমিত্তমাত্র। আমরা কেউ বাঁচব না। আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন এই রক্তমাখা পিচ্ছিল পৃথিবীটা ছুড়ে দিচ্ছ, আর একটা মানুষের হাড়ের পাহাড়ের উপর বসে যুধিষ্ঠির সোনার বাটিতে পায়েস খাচ্ছেন। আর কেউ নেই।"

কৃষ্ণ বললেন, "আমার কথা তুমি শুনলে না, তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে।"

কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন, "আশা করি, স্বর্গে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

তারপর তিনি চলে গেলেন অন্য দিকে, এর পর চতুর্দিকে রটে গেল যে, একটা মহাযুদ্ধ শিগগিরই শুরু হবে, এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় ঠিক হবার আগেই মৃত্যু হবে অসংখ্য মানুষের।

বিদুরকে কুন্তী বললেন, "দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হচ্ছে না, যুদ্ধ হলেও দোষ, না হলেও তো উপায় নেই। আমার ছেলেরা পারবে তো? কৌরবপক্ষে এত বড়-বড় সব যোদ্ধা, দ্রোণ হয়তো তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে তেমন ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করবেন না, আর পিতামহ ভীষ্মেরও তো পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহের ভাব আছে, কিন্তু কর্ণ? তাকে নিয়েই তো আমার বেশি ভয়। সে অর্জুনের চেয়েও বড় যোদ্ধা কি না

কে জানে! দুর্যোধন তো তার উপরেই বেশি ভরসা করে। আর সেও পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে সব সময়!”

এইসব চিন্তা করতে-করতে আর থাকতে না পেরে পরদিন দুপুরবেলা কুন্তী একা-একা চলে এলেন গঙ্গা নদীর ধারে। সেখানে কর্ণ রোজ তপস্যা করেন কিছুক্ষণ। কুন্তী কর্ণের পিছনে, প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

এই অংশটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘কর্ণ-কুন্তী সংবাদ’ নামে একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। যে বাঙালির সন্তান সেই কবিতা পড়েনি, তার জীবনই বৃথা, আমরাও পরে সেই কবিতাটি পড়ে নেব, মুখস্থ করেও ফেলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ সময়টি লিখেছেন সন্ধেবেলা, আসলে কর্ণ তপস্যা করতেন মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে। তাঁর মন্ত্র পড়া শেষ হবার পর তিনি পিছন ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন, রোদ্দুরে পুড়ে তাঁর চেহারাটা তখন শুকনো পদ্মফুলের মতো। কর্ণ খুব অবাক হলেও, হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, “আমি অধিরথ আর রাধার সন্তান, আমার নাম কর্ণ, আমাকে কী করতে হবে, আদেশ দিন।”

কুন্তী বললেন, “না বৎস, তুমি রাধার গর্ভে জন্মাওনি, অধিরথও তোমার বাবা নন। তুমি আমার ছেলে। আমার বিয়ের আগে

সূর্যদেবের আশীর্বাদে তোমার জন্ম। তুমি নিজের ভাইদের চেনো না, দুর্যোধনের সেবা করছ, তা মোটেই উচিত নয়। অর্জুন যেসব রাজ্য জয় করেছিল, তা এখন দুর্যোধনরা অন্যায় ভাবে হরণ করে রেখেছে। তুমি পাণ্ডবদের পক্ষে গিয়ে তা হরণ করে নাও । সবাই দেখুক অর্জুন আর কর্ণ পরস্পরের ভাই, তারা একসঙ্গে দাঁড়ালে তাদের সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে?”

কর্ণ বললেন, “আপনার কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে না, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে জন্মের পরই ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেননি? সারাজীবন আমাকে ক্ষত্রিয় বলে কেউ মানেনি, কত জায়গায় অপমান সহ্য করতে হয়েছে, কোনও শত্রুও কি মানুষের এত ক্ষতি করতে পারে? যথাসময়ে আপনি আমায় দয়া করেননি, এখন নিজের স্বার্থে আপনি আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন। কৃষ্ণ আর অর্জুনের মিলিত শক্তির কথা কে না জানে? আমি এখন ওদের দলে যোগ দিলে সবাই বলবে, আমি ভয় পেয়ে ওদিকে গিয়েছি। আমি যে পাণ্ডবদের ভাই, তা কেউ জানে না, যুদ্ধের সময় আমি ওদের পাশে দাঁড়ালে সবাই কী ভাববে? ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সব সময় আমাকে সম্মান করেছে, আমার উপর ভরসা করে তারা যুদ্ধে যেতে চাইছে, এখন আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব? ছিঃ!”

কুন্তীর নিরাশ ও ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে কর্ণ বললেন, "আপনি যা চাইতে এসেছেন, তা একেবারে ব্যর্থ হবে না। অর্জুন ছাড়া আপনার চার ছেলে হাতের কাছে এলেও আমি তাদের হত্যা করব না, কথা দিচ্ছি। যুদ্ধ হবে আমার আর অর্জুনের সঙ্গে। হয় অর্জুন আমার হাতে নিহত হবে, অথবা আমি তার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গে যাব। অর্জুন অথবা আমি। একজনই বাঁচবে। শেষ পর্যন্ত আপনার পাঁচটি ছেলেই থাকবে।"

কুন্তী তখন কাঁপতে-কাঁপতে এসে কর্ণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দৈবের বশে যা হবার তা তো হবেই। অর্জুন ছাড়া অন্য চারজন ভাইকে তুমি অভয় দিয়েছ, এই শপথ যেন মনে থাকে।"

কর্ণ প্রণাম করলেন কুন্তীকে, তারপর দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে।

এরপর দু' পক্ষেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের প্রস্তুতি। হুট করে যুদ্ধ শুরু করা যায় না। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয় এই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রচুর খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এত সৈন্যসামন্তর প্রতিদিন খাবারদাবারের ব্যবস্থা, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে রাখা দরকার। রাতে থাকার জন্য খাটাতে হবে অসংখ্য তাঁবু।

দু' পক্ষকেই সেনাপতি বেছে নিতে হবে। পাণ্ডবপক্ষে অনেক

বড়-বড় বীর রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কে হবেন সেনাপতি? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি করা যাক, তাতে প্রবীণরা কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না। কৌরবদের এত আলোচনার দরকার হল না। ভীষ্ম বয়সে সকলের চেয়ে বড়, সকলের শ্রদ্ধেয়, যোদ্ধা হিসেবেও অসাধারণ, তাই দুর্যোধন তাঁকেই অনুরোধ করলেন। ভীষ্ম রাজি হয়েও বললেন, "বৎস, আমি তোমাদের সঙ্গেই এতকাল আছি, তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করব ঠিকই। তবে তোমরা আর পাণ্ডবরা আমার কাছে সমান। পাণ্ডুর ছেলেদের কাউকেই আমার হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু আমি প্রতিদিন অন্তত দশ হাজার পাণ্ডব সৈন্য বধ করব।"

যুদ্ধ শুরুর আগে, কিছু-কিছু নিয়মকানুন ঠিক করা হয়, যা দু' পক্ষই মেনে নেয়। সারাদিন যুদ্ধের পর, সন্ধে হলে, তখন কোনও শত্রুতা থাকবে না। যুদ্ধ হবে সমানে-সমানে, অর্থাৎ রথীর সঙ্গে রথীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের। নিরস্ত্র লোককে কেউ মারবে না, কেউ যদি যুদ্ধ থামিয়ে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করা হবে, ইত্যাদি। অর্থাৎ বেশ ভদ্রতা, সভ্যতা মেনে যুদ্ধ।

একদিন কৌরব শিবিরে কে কত পরাক্রান্ত বীর, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে। রথী, মহারথ, অতিরথ এইরকম ভাবে যোদ্ধাদের বিচার করা হয়। ভীষ্ম সকলের কথাই জানেন, তিনি বললেন, "দুর্যোধন,

তুমি ও তোমার ভাইরা সকলে শ্রেষ্ঠ রথী। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদের মামা হন, তবু তিনি তোমাদের দলে যোগ দিয়েছেন, তিনি অতিরথ। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ। ইনি দেবতাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারেন।”

তারপর ভীষ্ম একে-একে অন্য রাজাদের কাউকে মহারথ, কাউকে অতিরথ বলতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার এই বন্ধুটি, কর্ণ, যে সব সময় গর্ব করে কথা বলে, সে অতিরথ নয়, পূর্ণ রথীও নয়। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে ওকে আর বেঁচে ফিরে আসতে হবে না। আমার মতে, ও অর্ধরথ।”

যে-কোনও কারণেই হোক, ভীষ্ম কোনও দিনই কর্ণকে সুনজরে দেখেন না। তাঁর মতো মহাবীরকে অর্ধরথ বলা তো দারুণ অপমান করা। কর্ণ দ্রোণাচার্যের শিষ্য নন, তাই দ্রোণাচার্য কর্ণকে পছন্দ করেন না, যখন-তখন খোঁচা মারেন। তিনিও বললেন, “হ্যাঁ, ভীষ্ম তো ঠিকই বলেছেন, কর্ণের তেজ আছে, আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েও যায়। ও দয়ালু আর অসাবধান, ওকে তো অর্ধরথই বলা উচিত।”

অসম্ভব রাগে জ্বলে ওঠেন কর্ণ। তিনি বললেন, “পিতামহ, আপনি বিনা দোষে আমাকে কুকথা বলেন, দুর্যোধনের জন্যেই আমি তা সহ্য করি। আপনি কৌরবদলের মধ্যে কাউকে বড়, কাউকে ছোট বলে ভেদ সৃষ্টি করছেন। আপনি আসলে কৌরবদের শত্রুতাই করতে চান।

দুর্যোধন, তুমি এঁকে হঠাও! বৃদ্ধ লোকদের কথা শোনা উচিত। কিন্তু খুব বেশি বৃদ্ধ লোকদের নয়, তখন তারা ছেলেমানুষের মতো হয়ে যায়।”

ভীষ্ম তারপরেও কর্ণের বিরুদ্ধে তড়পে উঠলেন।

তখন কর্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন, “এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভীষ্ম যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমি যুদ্ধ করব না।। এঁর মৃত্যু হলে তবেই আমি বিপক্ষের সমস্ত বীরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব।”

এ কী সাংঘাতিক কথা! অনেকটা কর্ণের ভরসাতেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সেই কর্ণ থাকবেন যুদ্ধের বাইরে? তাতে তো পাণ্ডবদেরই লাভ হল। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই ভীষ্ম আর দ্রোণ পাণ্ডবদের সাহায্য করলেন এতখানি! তবে কি ওঁরা দু’জন ইচ্ছে করেই কর্ণকে এমন রাগিয়ে দিলেন?

ভীষ্মও আর কর্ণকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন না, কর্ণও অটল রইলেন তাঁর প্রতিজ্ঞায়।

পরদিন সকালে দু’ পক্ষের সৈন্যসামন্তরাই স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে, পুজো ও ধ্যান সেরে নিয়ে চলে এল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। মাঝখানে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু’ পক্ষ দাঁড়াল মুখোমুখি। দু’ দিকেই পরিচিত বীরপুরুষরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন সামনের সারিতে। শুধু কর্ণ কোথাও নেই।

একটু পরেই শুরু হবে মহারণ।

॥ ১০ ॥

দু'পক্ষেই ভেরি আর শাঁখ বাজালে যুদ্ধ শুরু হয়। সেসব বেজেও উঠল, তবু একটাও অস্ত্র বিনিময় হল না। সকলে চুপ। কারণ, মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় অর্জুনের রথ এসে দাঁড়িয়েছে। সেই রথের সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সকলে অবাক হয়ে ভাবছে, এ কী করছেন অর্জুন? যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তো ওখানে আসার নিয়ম নেই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "প্রিয় বন্ধু, দেখে নাও কাদের সঙ্গে তোমায় যুদ্ধ করতে হবে। অনেকেই মহাবীর, তবু তোমার সমকক্ষ কেউ নয়। তুমিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে।"

অর্জুনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সারা শরীর কাঁপছে। তিনি খসখসে গলায় বললেন, "এ কী কথা বলছ তুমি? ও পক্ষে রয়েছেন আমার অনেক শ্রদ্ধেয় আর আত্মীয়রা। ভীষ্ম আমার পিতামহ, তিনি বাল্যকাল থেকে আমায় আদর করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব আর মারব? অস্ত্রগুরু দ্রোণ, ইনি প্রথম থেকেই আমার প্রতি বিশেষ

পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এমন-এমন সব গোপন অস্ত্র ব্যবহার শিখিয়েছেন, যে অস্ত্র কেউ জানে না। এখন আমি তাঁকে মারতে যাব? এত অকৃতজ্ঞ মানুষ হয়। আরও কতজন রয়েছেন আমার আত্মীয় কিংবা ভাইয়ের মতন, তাঁরা আমরা তো একই বংশের মানুষ, এই যুদ্ধে সেই বংশটাও ধ্বংস হয়ে যাবে। না, না, আমি এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারব না, তাতে যদি আমরা হেরেও যাই, তাতে কোনও দুঃখ নেই। এমনকী, আমায় কেউ মেরে ফেলতে চাইলেও মারুক। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই তো সবচেয়ে গৌরবময়।”

অর্জুনের হাত থেকে খসে পড়ল তাঁর তির-ধনুক, তিনি মুখ নিচু করে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, “এসব কী বলছ, পার্থ? এখানে তোমার এমন দুর্বলতা দেখানো মোটেই শোভা পায় না। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে চাইলে লোকে তোমাকে ক্লীব বলবে। (অর্থাৎ যে পুরুষও নয়, নারীও নয়।) শোনো, মানুষ হচ্ছে মরণশীল প্রাণী। বাচ্চা বয়স, তারপর কৈশোর-যৌবন, তারপর বার্ধক্য, এর পরেও কী থাকে, মৃত্যু! এ তো কেউ আটকাতে পারে না। সে কবে মরবে, তা আমিই ঠিক করে রাখি, আমিই কাল। আমি ওদের আগেই মেরে রেখেছি। এতে তোমার কোনও দায়িত্ব নেই, তুমি নিমিত্ত মাত্র। আরও শোনো

অর্জুন, কর্মেই মানুষের অধিকার, তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা ঠিক নয়।”

এর পরেও অর্জুন অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন কৃষ্ণকে। আর কৃষ্ণও উত্তর দিতে লাগলেন বুঝিয়ে-বুঝিয়ে। তাতে অনেকটা সময় লাগে, সারাদিনই কেটে যেতে পারে। কিন্তু দু' পক্ষের সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে রেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন সারাদিন ধরে এই আলোচনা করবেন, সেটা ঠিক সত্যি বলে মনে হয় না।

আমার ধারণা, এখানে অর্জুনকে যা-যা বলা হল, তা বেশ সংক্ষেপেই সারতে হয়েছে। বাকি সবটা আলোচনা করা হয়েছে যুদ্ধের ঠিক আগে কিংবা পরে। মহাভারতের এই অংশটাকে বলা হয় গীতা। সেটা আলাদা বই হিসেবেও পাওয়া যায়। অনেক হিন্দুর মতে, এই গীতা তাদের প্রধান ধর্মের বই। তবে অনেক হিন্দুই এ বই পড়েনি কিংবা পড়লেও মানে বোঝেনি। বইখানি নিজেদের কপালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

আমরাও আপাতত এই অংশটা এড়িয়ে যেতে চাই।

রথের উপর বসে অর্জুন আর কৃষ্ণ কী কথা বলছেন, তা তো অন্য কারও শোনার কথা নয়। মাত্র দু'জন শুনতে পেয়েছেন।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের ঘরে দুরুদুরু বক্ষে বসে আছেন। এই ভয়ংকর যুদ্ধে দু' পক্ষের অনেকেই মরবে আর তাঁদের এত বড়

বংশটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাও তিনি বুঝেছেন।

কিছুক্ষণ আগে ঋষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এই মহারণ নিজের চোখে দেখতে চাও? তা হলে আমি কিছুদিনের জন্য তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি। তুমি সব কিছু দেখতে পাবে।"

ধৃতরাষ্ট্র তক্ষুনি বললেন, "না, না, না, আমি দেখতে চাই না। আমার কত প্রিয়জন, পাণ্ডবদেরও আমি ভালবাসি আর আমার ছেলেরা আমার অবাধ্য হলেও তো ওরা আমারই সন্তান। যুদ্ধক্ষেত্রে মরবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। চাই না দৃষ্টিশক্তি।"

বেদব্যাস বললেন, "দেখতে না চাও, শুনতে চাও কি? আমি একটি ছেলেকে এনেছি, তার নাম সঞ্জয়। খুব মেধাবী। ওকে আমি বর দিয়েছি, ও বহু দূরের সব কিছু দেখতে পাবে, শুনতেও পাবে। ও সব সময় থাকবে তোমার পাশে।"

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে না চাইলেও এখন দারুণ আগ্রহ নিয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারপর কী হল? তারপর কৃষ্ণ অর্জুনকে অত কথা শোনাবার জন্যে কী করলেন, কোথায় গেলেন?

সঞ্জয় বললেন, "অর্জুন এখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ রথটা নিয়ে গেলেন পাণ্ডবদের শ্রেণির দিকে। সকলে তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই আছে। যুধিষ্ঠিরও বর্ম পরে, যুদ্ধের

পোশাকে সজ্জিত হয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে আছেন একটা রথে। এবার তিনি ভেঁপু বাজালেই শুরু হয়ে যাবে লড়াই।"

এই কথা বলতে-বলতেই সঞ্জয় খুব অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "এ কী, এ কী, যুধিষ্ঠির এ আবার কী করছেন?"

ধৃতরাষ্ট্রও ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? কী হল? কী করল যুধিষ্ঠির?"

এই সব কাহিনি যিনি শোনাচ্ছেন, সেই সৌতি থেমে গিয়ে একটু পরে শ্রোতা মুনি-ঋষিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে মান্যবরগণ, আমি তো অনেকটাই মহাভারত কথা শুনিয়েছি আজ। এখন আপনারা বিশ্রাম নিন। আবার কাল সকালে শুরু করা যাবে।"

তারপর ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ, বুঝতেই পারছি, আপনি ক্লান্ত। আপনার বিশ্রামের দরকার। আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল আবার সবই শোনাব।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "না, আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি। আমার বিশ্রামেরও দরকার নেই। যুদ্ধ শুরু হবে আজ, আর তুমি কাল শোনাবে সেই বাসি খবর? না, না, না, তুমি অন্তত আজ সন্ধে পর্যন্ত সব কিছু আমাদের জানাও।"

সমস্ত মুনি-ঋষিও চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "আমরা শুনতে চাই। আজই কী-কী ঘটছে সব জানাও।"

তখন সৌতি বললেন, "তা হলে এর পরের কিছুটা আমার চেয়ে সঞ্জয়ই ভাল বলতে পারবেন। মহামুনি বেদব্যাসের বরে সঞ্জয় সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে পারবেন, আমার তো সে ক্ষমতা নেই।"

সঞ্জয় বললেন, "হ্যাঁ, আমি বলতে রাজি আছি। ঋষির বরে আমার একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না। আমি এখন যা দেখছি, তা-ই বলে যাচ্ছি। আপনারা শুনেছেন যে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধসাজে বসে আছেন। এবার তিনি ভেঁপু বাজালে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। অনেকেই আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না।

"তারপর হঠাৎই দেখছি, যুধিষ্ঠির তাঁর যুদ্ধের সাজ খুলে ফেলছেন। সরিয়ে দিচ্ছেন সব অস্ত্রশস্ত্র। রথ থেকে নেমে খালি পায়েই ছুটতে লাগলেন দু' পক্ষের মাঝখানে খোলা জায়গায়।"

তাঁর ভাইয়েরা, পাণ্ডবপক্ষের বড়-বড় যোদ্ধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির কী করতে চাইছেন? অর্জুন আর ভীম তাঁর কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, এ কী করছেন? আমাদের সঙ্গে না থেকে কেন আপনি ছুটে যাচ্ছেন শত্রুপক্ষের দিকে?"

যুধিষ্ঠির তার কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটতে লাগলেন আরও জোরে। তখন তাঁর ভাইয়েরা, বড়-বড় রাজারাও দৌড়তে লাগলেন তাঁর পিছু-পিছু।

দু’ পক্ষের কেউ-ই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। পাণ্ডবপক্ষে সকলে নীরব। আর কৌরবপক্ষের কিছু-কিছু যোদ্ধা এই দৃশ্য দেখে ঠাট্টাইয়ার্কি আর রসিকতা শুরু করে দিল। কেউ-কেউ বলতে লাগল, “এ তো দেখছি পাণ্ডবপক্ষের রাজা না কুলাঙ্গার? এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ওঁদের পক্ষে তো অনেক ভাল-ভাল যোদ্ধা রয়েছেন। আছেন ভীম আর অর্জুন, তবু কি ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন? তবে বোধ হয় যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় বংশে জন্মাননি।”

যুধিষ্ঠির এসে থামলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি, মহাবীর ভীষ্মের রথের কাছে। হাত জোড় করে তিনি বললেন, “পিতামহ, আমরা বাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছি। আপনি দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন।”

ভীষ্ম একটুক্ষণ যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “প্রিয় বৎস, তুমি যদি যুদ্ধ শুরুর আগে এভাবে আমার সম্মতি নিতে না আসতে, তা হলে আমি অভিশাপ দিতাম, তোমরা হেরে যাবে, এখন তোমার এই সৌজন্যবোধ দেখে খুশি হয়ে বলছি, তোমরা সব নিয়ম মেনে যুদ্ধ করো, তোমাদেরই জয় হবে। দ্যাখো, মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবরা আমাকে অর্থ দিয়ে এমন ভাবে বেঁধেছে যে, ওদের পক্ষ নিয়েই আমাকে কাপুরুষের মতন যুদ্ধ করতে হবে। এখন কি তুমি কোনও বর চাও?”

যুধিষ্ঠির পিতামহের পা ছুঁয়ে বললেন, "আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন আর আমাদের মন্ত্রণা দেবেন। সেটাই যথেষ্ট।"

ভীষ্ম বললেন, "আমাকে তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। তুমি কী মন্ত্রণা চাও, এখন বলো। আমি সাধ্যমতন তা জানাতে চেষ্টা করব।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "ঠাকুরদা, কোনও যুদ্ধেই আপনি হারেন না, অথচ আপনাকে হারাতে না পারলে আমাদের পক্ষে এ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভবই নয়। আপনাকে আমরা কীভাবে হারাতে পারি?"

ভীষ্ম বললেন, "যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে, এমন তো কাউকে দেখি না। এমনকী স্বয়ং ইন্দ্রও আমাকে হারাতে পারেননি।"

যুধিষ্ঠির তখন এমন একটা প্রশ্ন করলেন, যা পৃথিবীর যে-কোনও যুদ্ধে দু' পক্ষের কেউ কখনও করে না।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে যুদ্ধে হারানো অসম্ভব। তা হলে বলে দিন, আপনাকে কীভাবে হত্যা করতে পারব?"

ভীষ্ম বললেন, "আমাকে কেউ হারাতেও পারবে না, মারতেও পারবে না। এখন আমার মৃত্যুকালও আসেনি। যাও, গিয়ে যুদ্ধ করো, কয়েক দিন পর এসো আমার কাছে।"

ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও কিন্তু যুধিষ্ঠির ফিরে গেলেন না। এবার তিনি সদলবলে গেলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণের কাছে। তাঁকেও যথারীতি প্রণাম ও সম্মান জানিয়ে যুধিষ্ঠির সেই একই প্রশ্ন করলেন তাঁকে।

অস্ত্রগুরুও সেই একই ভাবে বললেন, “তুমি যদি আমার অনুমতি নিতে না আসতে, তা হলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। এখন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করে যাও এবং জয়ী হও। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবরা অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে। তাই তোমাদের পক্ষে গিয়ে আমার যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তোমার কি অন্য প্রার্থনা আছে? বলো। আমি সাধ্যমতন তা পূরণ করার চেষ্টা করব।”

যুধিষ্ঠির বললেন, “আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আপনি আমাদের জয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিলেন। আপনাকে না হারাতে পারলে আমরা জয়ী হব কী করে? কী উপায়ে আপনাকে বধ করতে পারি?”

দ্রোণ বললেন, “আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যদি হঠাৎ রেগে যাই, অস্ত্রবর্ষণ শুরু করি, তখন আমাকে বধ করতে পারে, এমন তো কাউকে দেখি না। তবে আমি যদি কোনও কারণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে অজ্ঞানের মতন হয়ে যাই, তখনই আমাকে কেউ বধ করতে পারে।”

যুধিষ্ঠির এবার গেলেন আর-এক অস্ত্রগুরু কৃপের কাছে। সেখানে একই কথা বলে উত্তরও পেলেন আগের দু'জনেরই মতন। তবে কৃপ অমরত্বের বর পেয়েছেন আগেই, সুতরাং তাঁকে হত্যা করা যাবে না। তাঁকে অন্য ভাবে আটকে রাখতে হবে।

এর পর যুধিষ্ঠির গেলেন মদ্রদেশের রাজা শল্যের কাছে। তাঁকেও প্রণাম ও সম্মান জানিয়ে যুধিষ্ঠির সেই একই কথা বললেন।

এই শল্য আবার পাণ্ডবদের সম্পর্কে মামা। আগেই তিনি দুর্যোধনের পক্ষে লড়বেন বলে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন, "বৎস যুধিষ্ঠির, আমি চাই তোমরা এই যুদ্ধে জয়ী হবে। কৌরবপক্ষের দুর্যোধন অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছেন। তাই কৌরবপক্ষেই আমাকে লড়তে হবে। তুমি আর কী সাহায্য চাও বলো।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি কৌরবপক্ষেই যুদ্ধ করুন। তবে আপনি কি একটা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন?"

মহাবীর শল্য বললেন, "কী সাহায্য চাও, শুনি।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মামা, আপনি যদি যুদ্ধের মধ্যে নানারকম কথা বলে কর্ণের শক্তি আর তেজ খানিকটা কমিয়ে দিতে পারেন, তাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হবে।"

শল্য উদার ভাবে বললেন, "সে তো আমি করতেই পারি। বারবার

ওর মনোযোগ ভেঙে দেব। এখন যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ শুরু করো।”

এখানে একটা ব্যাপারে আমার বেশ খটকা লেগেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর শল্য, প্রত্যেকেই টাকার কথা বলছেন কেন? এঁরা কেউই গরিব নন। শল্য তো একটা রাজ্যের রাজা। দুর্যোধন কি এঁদের অনেক টাকা দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন? প্রথম তিন জনের কথার অন্য একটা মানে হতে পারে, এঁরা বহু বছর ধরে কৌরব রাজত্বে থেকেছেন। ‘তাই নুন খাই যার, গুণ গাই তার’ এই প্রবাদের মতন এঁরা অকৃতজ্ঞ হতে চাননি, তাই এই যুদ্ধেও তাঁরা এই পক্ষেই থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু শল্যর ব্যাপারে তাও নয়। তিনি স্বাধীন রাজা, তিনিও কেন বলবেন টাকার কথা? তা হলে কি সেই কালেও টাকা দিয়ে বড়-বড় যোদ্ধাদের কিনে রাখা যেত? এর কোনও উত্তর নেই। এর আগেও আমরা দেখেছি যে, কয়েকটা ঘটনার ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, ধাঁধার মতন মনে হয়।

যাই হোক, এর পর আর কারও কাছে গেলেন না যুধিষ্ঠির। নিজের রথে ফিরে আবার যুদ্ধের সাজপোশাক পরতে লাগলেন।

এখন যুদ্ধ শুরু করতে আর কোনও বাধা নেই।

তবু যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়িয়ে খুব উঁচু গলায় কৌরবদের দিকে চেয়ে বললেন, “তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, যে এই অন্যায়

যুদ্ধে আমাদের পক্ষে থাকতে চায়, তা হলে চলে এসো এদিকে, আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নেব। কেউ আসবে?"'

একটুক্ষণ সকলে নীরব।

তারপর একজন সৈনিক কৌরবপক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে বলল, "হে মহারাজ, আমি এই যুদ্ধে তোমার পক্ষেই থাকতে চাই। আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ করব কৌরবদের বিরুদ্ধে।"

সকলে অবাক হয়ে বলল, "এ তো ধৃতরাষ্ট্রেরই এক ছেলে। দুর্যোধনের আপন ভাই। এর নাম যুযুৎসু।"

যুধিষ্ঠির দু' হাত বাড়িয়ে বললেন, "এসো, এসো ভাই, তোমাকে এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য বরণ করে নিচ্ছি।"

সঞ্জয় বোধ হয় এই দৃশ্যটার কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেননি। তা হলে তিনি আরও ভেঙে পড়তেন।

তিনি বললেন, "এ কী, সকলে এত চুপচাপ কেন? এখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি? প্রথম তিরটা কে ছুড়ল?"

সঞ্জয় বললেন, "ঠিক বোঝা গেল না। খুব সম্ভবত আপনার দ্বিতীয় ছেলে দুঃশাসন। সে ছুটতে-ছুটতে ভীষ্মের কাছে এসে আরও অনেকে মিলে ভীষ্মকে ঘিরে ধরে এগোতে লাগল পাণ্ডবদের দিকে।"

আগেই ঠিক হয়ে আছে যে, রথে চড়ে যিনি যুদ্ধ করবেন, তার বিরুদ্ধে লড়তে আসবেন অন্য পক্ষের এক রথী। পায়ে হাঁটা সৈন্যদের

সঙ্গে লড়বে অন্য পদাতিকরা। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে সমানে-সমানে। অবশ্য সব সময় এই নিয়ম সম্ভব নাও হতে পারে।

এ রকম সামনাসামনি যুদ্ধে এক-একদিন এক-একজনের তেজ বেশি জ্বলে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হতে না-হতেই ভীম এমনই হিংস্র হয়ে উঠলেন যে, দূর থেকে তাঁকে দেখেই অনেকে পালাতে শুরু করল। অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু আর ভীমের ছেলে ঘটোৎকচকে এর আগে কেউ যুদ্ধ করতে দ্যাখেনি। আজ বোঝা গেল, এরা দু'জনেই খুব বড় যোদ্ধা। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি প্রান্তর জুড়ে। পাণ্ডবরা এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় যে রাজ্যে লুকিয়ে ছিলেন, সেই রাজ্যের রাজকুমার উত্তর একবার কী করেছিলেন, তা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। কৌরবরা সেই রাজ্য আক্রমণ করলে উত্তর অনেক হম্বিতম্বি করেছিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অন্য পক্ষের বড়-বড় যোদ্ধাকে দেখেই ভয়ের চোটে পালাতে চেয়েছিলেন। এখন দেখা গেল, এর মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন, যুদ্ধ করছেন প্রবল বিক্রমে। তাঁর এক ভাই শ্বেতও খুব তেজস্বী যোদ্ধা। এই দুই ভাই মিলে রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন। শ্বেত একসময় মহারথী ভীষ্মের সঙ্গেও মুখোমুখি যুদ্ধ করতে এলেন।

কৌরবদের সৈন্যবাহিনী পাণ্ডবপক্ষের চেয়ে অনেকটাই বেশি। ভীষ্ম বলে রেখেছেন, তিনি প্রত্যেকদিন পাণ্ডবপক্ষের অন্তত দশ

হাজার সৈন্যকে যমের বাড়ি পাঠাবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন লড়াই শুরু করলেন, যা অন্য পক্ষের কারও প্রতিরোধ করার সাধ্য নেই। ভীষ্ম একসঙ্গে অনেক বাণ চালাতে-চালাতে সারা আকাশই ঢেকে দিলেন। তখন বোঝা গেল না যে, ভীষ্ম অত বৃদ্ধ বা তাঁর শরীরে একটুও দুর্বলতা আছে।

ভীষ্মকে আটকাবার জন্য একসময় অর্জুন চলে এলেন তাঁর সামনে। দু'জনেই তুমুল ভাবে চালাতে লাগলেন সংগ্রাম। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ভীষ্মও চান না অর্জুনকে মেরে ফেলতে আর অর্জুনও চান না পিতামহকে নিজের হাতে নিহত করতে। অথচ দু'জনের মধ্যে একজন নিহত না হলে এ লড়াই শেষ হবে কী করে? দু'জনেই মাঝে-মাঝে আকাশ দেখতে লাগলেন। কখন সন্ধে নামবে? একটু পরেই মুছে গেল দিনের আলো। বেজে উঠল শঙ্খ, ভেরি, দুন্দুভি, তাতেই বোঝা গেল যে, আজকের মতন যুদ্ধ শেষ।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ, প্রথম দিনে আপনাদের পক্ষই কিছুটা জয়ী হয়েছে বলা যায়। কৌরবদের মধ্যে কোনও বীরই প্রাণ দেননি, পাণ্ডবপক্ষে কিন্তু হারাতে হয়েছে উত্তর আর শ্বেত নামে দুই রাজকুমারকে। তাঁরা রণক্ষেত্রে বীরের মতন প্রাণপণে যুদ্ধ শুরু করে প্রাণ দিয়েছেন।"

সন্ধেবেলায় যুদ্ধ শেষ হলে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে যেখানে-সেখানে

শুয়ে পড়ে, কেউ-কেউ স্নান করতে যায়, খিদের জ্বালায় পেট পুড়ছে, শুরু হয়ে যায় খাদ্য পরিবেশন।

কয়েকজন বড়-বড় পাণ্ডবদলের যোদ্ধা মিলে আড়ালে বসে আলোচনা করেন সেদিনের যুদ্ধ নিয়ে। কী-কী ভুল হয়েছিল, কোথায় তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

যুধিষ্ঠিরের প্রধান ভয় কর্ণকে নিয়ে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, একমাত্র কর্ণই পারেন অর্জুনকে হারিয়ে দিতে। কর্ণ এখনও আসেননি, কর্ণকে চটিয়ে দিয়ে ভীষ্ম তাঁকে সেনাবাহিনীর বাইরে রেখেছেন, তাতে পাণ্ডবদেরই উপকার হয়েছে। কিন্তু এখন সেই ভীষ্মই পাণ্ডবদলের প্রধান শত্রু। সেই বৃদ্ধ যে এতটা দাপটের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, তা কেউ ভাবেইনি। এখন ভীষ্মকে সরিয়ে দিতে না পারলে জয়ের কোনও আশা নেই। তবে একটা ব্যাপার সকলে লক্ষ করেছে, বড়-বড় বীরেরা যখন একসঙ্গে যুদ্ধ চালায় ভীষ্মের সঙ্গে, তখন সেই দলে অংশ নেন শিখণ্ডী নামে দ্রুপদ রাজার এক ছেলে। একমাত্র তাঁকে দেখলেই ভীষ্ম যেন কিছুটা দুর্বল হয়ে যান। তার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ না করে ভীষ্ম চলে যান অন্যদিকে।

কেন? এবার সেই গল্পটা শুনে নিতে হবে।

॥ ১১ ॥

পরদিন একই সময়ে, একই জায়গায় মুখোমুখি দাঁড়ালেন দু' পক্ষ। এই সব যুদ্ধে কোন দল শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে, যুদ্ধ কতদিন চলবে, এই চিন্তা, এই দুশ্চিন্তা সব সময় যোদ্ধাদের মন জুড়ে থাকে। দু' পক্ষেই বড়-বড় বীর আছেন, তাই শেষ পর্যন্ত কোন দল যে জিতে যাবে, তা এখন বলা খুবই শক্ত।

পাণ্ডবপক্ষে রাজা যুধিষ্ঠির সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করেন কর্ণকে নিয়ে। এখনও যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক, তা জানেন না। তিনি মনে করেন, অর্জুনের চেয়ে কর্ণই যুদ্ধবিদ্যায় বেশি দক্ষ। সে যদি হঠাৎ অর্জুনকে হারিয়ে দেয়, তা হলে তো পাণ্ডবদের জয়ী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাও থাকবে না। কর্ণ এখনও যুদ্ধে যোগ দেননি বটে, কিন্তু যে-কোনও সময় কর্ণ তো এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়তেও পারেন। তখন কী হবে?

কৌরবপক্ষেও প্রধান দুশ্চিন্তা অর্জুনকে নিয়ে। অর্জুন যে কত বড়

যোদ্ধা, তা দুর্যোধনও জানেন। কিন্তু তাঁর দলেও ভীষ্ম, দ্রোণের মতন যোদ্ধা আছেন, যাঁদের হারাবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারও নেই। এঁরা যদি মিলিত ভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করেন, তা হলে অর্জুন কী করে যুঝবেন? তাঁকে পিছু হঠতে হবে।

তাই বুক ভরতি অভিমান নিয়ে দুর্যোধন কিছু আগে ভীষ্মের কাছে গিয়ে বলেছেন, "পিতামহ, আপনি কর্ণকে অপমান করলেন বলে, সে আর যুদ্ধ করতেও এল না। এতে আমাদের দলের কত ক্ষতি হয়ে গেল! আমি আশা করেছিলাম, আপনি একাই ওদের শেষ করে দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখছি, পাণ্ডবভাইদের মধ্যে কেউ যদি আপনার সামনে চলে আসে, তখন আপনি কেমন যেন নরম হয়ে যান। ওদের সঙ্গে মন দিয়ে যুদ্ধ করতে চান না। অন্যদিকে সরে যান! তা হলে কি এটাই বুঝব যে, আপনি আমাদের পক্ষে লড়াই করলেও, আপনি ওদেরই জিতিয়ে দিতে চান?"

ভীষ্ম বললেন, "তুমি যা অভিযোগ জানালে তার কিছুটা সত্যি তো বটেই। পাণ্ডবভাইদের কাছাকাছি দেখলেও তাদের হত্যা করার জন্য আমার হাত ওঠে না। আমার কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবরাও তো সেই রকমই স্নেহের। ওদের আমি মারি কী করে? তবে, তোমাদের কাছে আমি যে শপথ করেছিলাম, আজ থেকে তা নির্ঘাত পালন করব। প্রত্যেক দিন আমি ওদের পক্ষের অন্তত দশ হাজার সৈন্যকে

শেষ করে দেব। না, আমি তোমাদের পক্ষের পরাজয় চাই না মোটেই। আমি তো বলেছিই, যে-দলে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমের মতন বীররা রয়েছে, তাদের পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। তোমরা যদি এখনই যুদ্ধ থামিয়ে দিতে চাও, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করো, তা হলেই এই বংশ টিকে থাকবে।”

দুর্যোধন বললেন, “যুদ্ধ থামাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধি করতে আমি মোটেই চাই না। আমি আশা করেছিলাম, আপনার দাপটে পাণ্ডবপক্ষ পিছু হঠতে শুরু করবে।”

ভীষ্ম বললেন, “আমি যদি রোজ দশ হাজার সৈন্যকে শেষ করে দিতে পারি, তা হলে কয়েক দিনের মধ্যে ওদের পক্ষের সৈন্য আর থাকবে না। দেখো, এই পদাতিক সৈন্যরাই যুদ্ধের গতি-টতি পালটে দিতে পারে। চলো, দেখা যাক এর পরে কী হয়।”

ভীষ্ম আবার বললেন, “শোনো, এই কথাটা মনে রেখো, শিখণ্ডী নামে ওই দিকের দলের একজন যোদ্ধা আছে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না। সে আমার দিকে অস্ত্র ছুড়লেও আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব। তখন তোমরা যদি পারো, আমাকে ঘিরে রেখো।”

পাণ্ডবপক্ষে এত বড়-বড় সব বীর আছেন, তাদের সবার বিরুদ্ধেই ভীষ্ম লড়ে যেতে পারেন, শুধু শিখণ্ডী নামের একজন মাঝারি ধরনের যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন না কেন?

কে এই শিখণ্ডী?

আমরা জানি যে, আগেকার রাজা বিচিত্রবীর্যের বিয়ের সময় বেশ গোলমাল হয়েছিল। ভীষ্ম তো আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তিনি কখনও সিংহাসনে বসবেন না। বিয়েও করবেন না। এই বংশেরই একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে ভীষ্মই দেশটাকে চালান।

বিচিত্রবীর্য ছিলেন দুর্বল ধরনের মানুষ। নিজে-নিজে যে বিয়ে করবেন, সে সাহসও তাঁর নেই। ভীষ্ম তখন বুঝলেন, তাঁকেই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন যে, কাশীর রাজা তাঁর তিন মেয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করছেন। সেখানে বিচিত্রবীর্যকে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু বিচিত্রবীর্যের দুর্বল চেহারা দেখে যদি কোনও মেয়েই তাঁর গলায় মালা না দেয়? তাতে তো এই বংশের উপরেই কলঙ্কের দাগ পড়বে। তখনই ভীষ্ম এমন একটা কাণ্ড করলেন, যার ফলাফল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল।

ভীষ্ম নিজেই গেলেন সেই স্বয়ংবর সভায়, বিচিত্রবীর্যকেও সঙ্গে নিলেন না। প্রথমে ভীষ্মকে দেখে সকলেই বেশ অবাক। ভীষ্ম যে বিয়ে করবেন না, তা তো সারা দেশের মানুষই জানে, ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকেই তুলে নিলেন তাঁর নিজের রথে।

ভণ্ডুল হয়ে গেল স্বয়ংবর সভা।

অন্য রাজারা এতে অপমান বোধ করলেন। কয়েকজন রে রে করে

তেড়ে গেলেন ভীষ্মের রথের দিকে। ভীষ্ম যে কত বড় যোদ্ধা, তা ওই আক্রমণকারীরা অনেকেই জানেন। তবু ভীষ্মের সঙ্গে লড়াই করতেই হয়, নইলে মান থাকে না।

এক-এক করে রাজারা সরে যেতে লাগলেন। ভীষ্ম ওই তিন রাজকন্যাকে নিয়ে এলেন হস্তিনাপুরে। তখনকার দিনে রাজারা, এমনকী অনেক সাধারণ মানুষও যত ইচ্ছে তত মেয়েকেই বিয়ে করতে পারত। ভীষ্ম ঠিক করলেন, এই তিনটি মেয়েকেই একসঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। বিবাহ-বাসর সাজানো হচ্ছে দারুণ ভাবে। এরই মধ্যে অম্বা নামের বড় মেয়েটি ভীষ্মের কাছে এসে লাজুক ভাবে বলল, সে রাজা শাল্বকে মনে-মনে নিজের স্বামী বলে ঠিক করে রেখেছে। শাল্বও তা জানেন। এখন কি অন্য কাউকে বিয়ে করা ঠিক হবে?

এ-কথা শুনে ভীষ্ম অবাক তো হলেনই, খুব বিরক্ত বোধ করলেন। তিনি অম্বাকে বললেন, "এ-কথা তুমি আগে আমাকে বললে না কেন? তা হলে আগেই তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম শাল্বর কাছে। এখন তুমি সেখানেই যাও।" কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর একজন ধাত্রীকে সঙ্গে দিয়ে অম্বাকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন রাজা শাল্বর কাছে।

অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তা ঠিকই। কিন্তু এর মধ্যে ভীষ্ম তোমাকে হরণ করে

নিয়ে গেলেন। তুমি ওঁদের কাছে ছিলে কয়েকটা দিন। এই অবস্থায় আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, সবাই আমাকে ছি ছি করবে। তুমি ভীষ্মের কাছে ফিরে যাও।"

সেখানে অম্বার কোনও স্থান নেই। সে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

সব কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, "এখন তো আর আমি বিচিত্রবীর্যর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারি না। রাজবাড়িতে তোমাকে আশ্রয় দেওয়াও ঠিক হবে না।"

একটা অসহায় মেয়েকে এদিক ওদিকে ঠেলে দিয়ে যে কত অপমান করা হচ্ছে, তা কেউ বুঝল না। কয়েকজন ঋষি অম্বাকে বললেন, "তুমি বরং তোমার বাপের বাড়ি ফিরে যাও।"

এবার রাগে ফুঁসে উঠে অম্বা বলল, "না, আমি বাপের বাড়িতে যাব না। আমার বাবাই তো আমাকে ভীষ্মের হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপর রাজা শাল্ব, এমনকী ভগবানও আমার উপর সুবিচার করেননি। তবে ভীষ্মের দোষই সবচেয়ে বেশি। আমি ভীষ্মের শাস্তি চাই।"

সেখানে কিছু মুনি-ঋষিও বুঝলেন যে, ভীষ্মের এই হঠকারিতাই অম্বার এই অবস্থার জন্য দায়ী!

কিন্তু ভীষ্মকে কে শাস্তি দেবে? সারা দেশে ভীষ্মের সমকক্ষ আর তো কোনও যোদ্ধা নেই। একমাত্র আছেন ঋষি পরশুরাম। একসময়

তিনি রাগের বশে দেশ থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে চান না। বাছাই করা কিছু-কিছু শিষ্যকে যুদ্ধবিদ্যা শেখান।

খবর পাঠানো হল পরশুরামের কাছে। তিনি তাড়াতাড়িই এসে গেলেন কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে। তখনও কয়েকজন শিষ্য অম্বাকে বললেন, "বৎস, তুমি ঠিক করে বলো, তুমি কি শুধু ভীষ্মকেই মেরে ফেলতে চাও? কিংবা গুরু পরশুরাম শাল্বকে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ করলেই তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেন।"

অম্বা বলল, "এখন আমি আর শাল্বকে বিয়ে করতে চাই না। আমি ভীষ্মেরই শাস্তি চাই।"

তখন শুরু হল ভীষ্ম আর পরশুরামের যুদ্ধ। ভীষ্মও একসময় পরশুরামের শিষ্য ছিলেন। তাই ভীষ্ম যুদ্ধ করতে-করতে পরশুরামকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুদেব, আপনি কী কারণে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে আনলেন, সেটাই তো এখনও বুঝিনি। আমি কী দোষ করেছি?"

পরশুরাম বললেন, "তুমিই তো এই মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। এখন একটাই মাত্র উপায় আছে, তুমি নিজে একে বিয়ে করো।"

ভীষ্ম বললেন, "তা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।"

চলতে লাগল যুদ্ধ।

এ এমন এক সমানে-সমানে যুদ্ধ, যা দেখতে এলেন বহু মানুষ, রাজা এবং দেবতারা। ভীষ্মের মা গঙ্গাদেবীকেও দেখা গেল পাতলা মেঘের আড়ালে।

এঁদের দু'জনের কাছে এমন কয়েকটা অস্ত্র আছে, যা প্রয়োগ করলে যার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, সে তো মরবেই, আরও বহু মানুষেরও চরম ক্ষতি হবে।

দেবতারা বারবার ভীষ্ম আর পরশুরামকে সেই অস্ত্র প্রয়োগ না করতে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। একসময় বোঝা গেল যে দু'জনের কেউই জিতবেন না, হারবেনও না। তখন অনেক মুনি-ঋষি, দেবতা আর গঙ্গাদেবী ভীষ্মকে এই যুদ্ধ থামিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন।

পরশুরামও বুঝলেন ব্যাপারটা। ভীষ্ম তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর এমন বীরত্ব দেখে তিনি মুগ্ধ। তিনি ভীষ্মকে বললেন, "এ দেশে তোমার তুল্য আর কেউ নেই। আমাদের এই মিছিমিছি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে আছে? বরং চলো, এবার আমরা বাড়ি যাই।"

তিনি অম্বাকেও ডেকে বললেন, "তুমি দেখলে তো ভীষ্মকে শাস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তুমি বরং ভীষ্মের কাছেই চলে যাও। তাঁর শরণ নাও। এ ছাড়া আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না।"

অম্বা বলল, "আমি কিছুতেই ভীষ্মের কাছে আশ্রয় নিতে যাব না।

আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, তা তো দেখলাম। এবার আমিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মকে হত্যা করব।"

কিন্তু অম্বা আর কতটুকু যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে? সে ভীষ্মের মুখোমুখি হবে কী করে? তখন সে শুরু করল কঠোর তপস্যা। কোনও নারীকে এত কঠোর তপস্যা করতে আগে কেউ দেখেনি এখানে।

অবশেষে একদিন স্বয়ং মহাদেব এসে উপস্থিত হলেন। এবং সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার কাছে কী বর চাও?"

অম্বা উত্তর দিল, "আমাকে বর দিন, যাতে আমি ভীষ্মকে হত্যা করতে পারি।"

মহাদেব বললেন, "তুমি এ জন্মে পারবে না। পরের জন্মে..."

এখানে মহাদেব এমন একটা কথা বললেন, যেটার মানে ঠিকঠাক বোঝা যায় না।

তিনি বললেন, "এ জন্মে তো পারবে না। পরের জন্মে তুমি দ্রুপদ রাজার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তারপর তুমি একসময় পুরুষ হয়ে যাবে। তখন তুমি পারবে ভীষ্মের মুখোমুখি হতে।"

এ আবার কী ধরনের বর? একজন মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আবার সে কিছু দিন পরে পুরুষ হয়ে যাবে, এ রকম কখনও হয় নাকি?

কিন্তু মহাদেব আর কিছুই বলতে চাইলেন না।

তিনি ফিরে যাওয়ার পর অম্বা ভাবল, যদি এ জন্মে আর কিছু

করার না থাকে, তা হলে শুধু-শুধু বেঁচে থেকে সময় নষ্ট করার কোনও মানেই হয় না। তখন সে বনের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বেলে স্বেচ্ছায় তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে মৃত্যু বরণ করল।

যথা সময়ে সে দ্রুপদ রাজার রানির গর্ভে জন্মাল একটি মেয়ে হয়ে। রানি খুব আশা করেছিলেন যে তাঁর এই সন্তানটি ছেলেই হবে। কিন্তু তা তো হল না। তাই তিনি প্রথম থেকেই ওই মেয়েটিকে পুরুষের মতন সাজিয়ে রাখেন, আর চতুর্দিকে রটে গেল যে রানির একটা ছেলেই হয়েছে।

এ সব অনেক দিন আগেকার কথা। অম্বার কথা কেউ তখন জানেই না। এই জন্মেই তার নাম রাখা হল শিখণ্ডী। রাজপুত্র হিসেবে তাকে একসময় না একসময় তো বিয়ে করতেই হবে। তখনও রানি শিখণ্ডীর আসল পরিচয় জানালেন না। এক রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শিখণ্ডীর।

কয়েক মাসের মধ্যেই সেই রাজকন্যা তার বাবাকে জানাল, "বাবা, তুমি এ কার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ? এ তো আমারই মতন একজন মেয়ে। মেয়েতে-মেয়েতে বিয়ে হয় নাকি?"

শিখণ্ডীর আসল পরিচয় জানাজানি হতেই চতুর্দিকে হুলস্থুল পড়ে গেল। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেউ কখনও এ রকম মিথ্যে বলে না। বহু লোক ছি ছি করতে লাগল দ্রুপদের নামে। কয়েকজন রাজা দ্রুপদকে

উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুদ্ধের আয়োজন শুরু করে দিল।

এরই মধ্যে শিখণ্ডী বেঁচে গেল এক অলৌকিক উপায়ে। মনের দুঃখে শিখণ্ডী একা-একা ঘুরে বেড়াত। একদিন সে বনের মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ি দেখতে পেল। সেখানে আপাতত কেউ নেই। এক যক্ষ সেই বাড়ির মালিক। যক্ষরা ঠিক দেবতা নয়, আবার সাধারণ মানুষও নয়, মাঝামাঝি।

আড়াল থেকে সেই যক্ষ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কী চাও?"

শিখণ্ডী জানে যে, এই যক্ষরা অনেক সময় মানুষদের খুব সাহায্যও করে। তাই শিখণ্ডী নিজের পরিচয় জানিয়ে কাতর গলায় বলল, "আমি খুব বিপদে পড়েছি। তাই আপনার কাছে একটা প্রার্থনা জানাতে চাই। আপনি আমাকে আপনার পুরুষ পরিচয়টাই কিছুদিনের জন্য ধার দেবেন? তা হলেই আমি বাঁচতে পারি।"

যক্ষরা ইচ্ছে করলে অনেক কথাই জানতে পারে। এই যক্ষও নিশ্চয়ই শুনেছিল যে, শিখণ্ডী মেয়ে না পুরুষ এই নিয়ে দারুণ একটা শোরগোল হচ্ছে।

যক্ষ বলল, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে আমার পুরুষ পরিচয়টা ধার দিতে পারি। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে, তোমার উদ্দেশ্য সফল হলে আমার কাছে এসে সেই পুরুষ পরিচয়টা ফেরত দেবে।

তুমি যতদিন পুরুষ থাকবে, ততদিন আমাকেও তো নারী হিসেবে থাকতে হবে।”

শিখণ্ডী বলল, “আমি শপথ করছি, আপনাকে এই পরিচয় অবশ্যই ফিরিয়ে দিয়ে যাব।”

তার একটু পরেই শিখণ্ডী পুরোপুরি পুরুষ হয়ে গেল। তার শরীরে নারীত্বের কোনও চিহ্নই রইল না।

ফিরে এসে শিখণ্ডী সব কথা জানাল বাবা-মাকে। তাঁদের আর আনন্দের সীমা রইল না। এর মধ্যেই রাজা দ্রুপদকে কত রকম অপমান যে সহ্য করতে হয়েছে মিথ্যে কথা বলার জন্য। এবার তিনি সগর্বে বলে দিলেন, “মোটেই আমি মিথ্যে কথা বলিনি। শিখণ্ডী আমার ছেলে, মেয়ে তো নয়। যার ইচ্ছে, দেখে যেতে পারে।”

এখন শিখণ্ডী সত্যিই একজন পুরুষ। এবং সে অস্ত্রবিদ্যাও শিখতে লাগল। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে লড়তে লাগল প্রাণপণে।

কিন্তু যখনই সে ভীষ্মর কাছাকাছি আসে, তখনই তিনি অস্ত্রত্যাগ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। কেন ভীষ্ম এই রকম আচরণ করছেন, তা বুঝতে পারল না কেউ।

এই সময়ই বোঝা গেল, মহাদেব অম্বাকে যে অদ্ভুত ধরনের বর দিয়েছিলেন, তার সঠিক মর্ম পরিষ্কার হয়ে গেল। শিখণ্ডী যদি প্রথম

থেকেই নারী হত, তা হলে সে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেই পারত না। ভীষ্মর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগই পেত না। আর সে যদি প্রথম থেকেই পুরুষ হত, তা হলে ভীষ্ম একটুক্ষণের মধ্যে তাকে মেরে ফেলতে পারতেন।

ভীষ্মর মতন বীরপুরুষরা কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। কিন্তু শিখণ্ডী তো এখন একজন মাঝারি ধরনের যোদ্ধা। তার সঙ্গে কেন লড়বেন না ভীষ্ম? তিনি এই শিখণ্ডীর আগের জন্মের সব কথা জানেন। এই শিখণ্ডীই তো সেই অম্বা, তাই ওকে দেখলেই ভীষ্মের মনে অম্বার মুখটাই ভেসে ওঠে। এর সঙ্গে তিনি লড়বেন কী করে?

সেই জন্য একটু সুযোগ পেলেই শিখণ্ডী ভীষ্মর কাছাকাছি এসে নানারকম অস্ত্র ছুড়তে থাকে। ভীষ্ম তা আটকানোরও চেষ্টা করেন না। তখন কৌরবপক্ষের বড়-বড় বীররা শিখণ্ডীর কাছে এসে ভীষ্মকে আড়াল করে যুদ্ধ করতে থাকেন। একসময় শিখণ্ডী পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

এবার আমরা ফিরে আসি আজকের যুদ্ধের কথায়। ভীষ্ম মন দিয়ে যুদ্ধ করছেন না বলে দুর্যোধন তাঁকে অনুযোগ করেছিলেন। তাই ভীষ্ম যেন আজ খেপে উঠলেন। ভুলে গেলেন তাঁর বয়সের কথা। তিনি কথা দিয়েছেন যে, প্রতিদিন তিনি অন্তত দশ হাজার সৈন্য

বিনাশ করবেন। কিন্তু শুধু তির-ধনুক দিয়ে দশ হাজার মানুষের প্রাণ হরণ করা কি সোজা কথা? সেই জন্যই ভীষ্ম এত দ্রুত তির চালাতে লাগলেন, যাতে পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যরা টপাটপ মরে যেতে লাগল। অনেকে ভয়ে পালাল, অন্ধকার হয়ে এল আকাশ।

পাণ্ডবপক্ষের বীররা সেই দৃশ্য দেখে হতবাক। তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হল, এই বৃদ্ধকে সরিয়ে দিতে না পারলে এই যুদ্ধ জয়ের কোনও আশা নেই। কিন্তু ওঁকে সরাবার সাধ্য আছে কার? একমাত্র অর্জুনই ভীষ্মের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতামহের শরীরে আঘাত করতে চান না। দূরে চলে যান। পাণ্ডবপক্ষের বীর যোদ্ধারা দূরে দাঁড়িয়ে ভীষ্মর এই পরাক্রমের দৃশ্য দ্যাখেন আর অসহায় ভাবে নিজেদের দিকে চেয়ে থাকেন।

এরই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি ভীষ্মর এই প্রতাপ সহ্য করতে পারছিলেন না। পাণ্ডব বীররা কেউই ভীষ্মকে থামাবার চেষ্টা করছেন না। কৃষ্ণ তো অর্জুনকে বলেই দিয়েছেন, যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। এতে ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এই সব পরিচয়ের আর কোনও মূল্য থাকে না। তবু অর্জুন দ্বিধা করছেন।

কৃষ্ণ ঠিক করলেন, তিনিই ভীষ্মকে বিনাশ করবেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন কৃষ্ণ। ছুটলেন ভীষ্মর রথের দিকে।

কৃষ্ণের একটা সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, তার নাম সুদর্শন চক্র। সেটা

কাছে রাখতে হয় না। মনে-মনে তাকে ডাকলেই সে চলে আসে।

কৃষ্ণকে ওই ভাবে ছুটতে দেখে পাণ্ডবরা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর অর্জুনও ছুটতে লাগলেন কৃষ্ণকে ধরার জন্য।

কাছে এসে তিনি কৃষ্ণের হাত চেপে ধরে বললেন, "এ কী করছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ?"

কৃষ্ণ বললেন, "তোমরা তো কেউ তোমাদের পিতামহকে মারবে না। তাই আমিই সে কাজটা সেরে দিচ্ছি। আজ আর ভীষ্মর নিস্তার নেই।"

অর্জুন বললেন, "না, না, এ কাজ তুমি করতেই পারো না।"

কৃষ্ণ বললেন, "কেন পারব না? উনি তো আমার পিতামহ নন। ওঁর সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতাও নেই। তুমি কী ভাবছ? আমি ভীষ্মর সমকক্ষ নই?"

অর্জুন বললেন, "না কৃষ্ণ, আমি জানি যে, তুমি ইচ্ছে করলে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারো। কিন্তু দুর্যোধনের কাছে কথা দিয়েছিলে যে, এই যুদ্ধে তুমি আমাদের দিকে থেকে শুধু পরামর্শ দিতে পারো। বড়জোর রথের সারথিও হতে পারো। কিন্তু কোনও অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না। এখন যদি তুমি নিজেই নিজের কথা না রাখো, তা হলে লোকে তোমায় খুবই অপবাদ দেবে, আমাদেরও ছাড়বে না। না কৃষ্ণ, এ কাজ তোমাকে মানায় না। আমরা যদি এই যুদ্ধে জয়ী হতে নাও পারি, তবু আমরা কোনও অধর্ম করব না।"

আরও একটুক্ষণ এই সব নিয়ে কথাবার্তার পর কৃষ্ণের মেজাজ শান্ত হল। তিনি বুঝলেন যে, এই কাজটা করা তাঁর পক্ষে ঠিক হচ্ছিল না।

এর পর একদিন অন্য রকম যুদ্ধ হল। এর আগে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হত। আজ শিখণ্ডীকেই ডেকে আনা হল সামনে। তার আড়ালে কয়েকজন বীর। এখন সকলে জেনে গিয়েছে যে, শিখণ্ডীকে দেখলেই ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করেন। তাই শিখণ্ডী একেবারে সামনে গিয়ে ভীষ্মর উদ্দেশে যা ইচ্ছে বাণ মারতে লাগল। তার আড়াল থেকে অন্য বীরেরাও তির বর্ষণ করতে লাগল অজস্র। ক্রমে এমন অবস্থা হল, শজারুর যেমন সারা শরীরেই বড়-বড় কাঁটা থাকে, ভীষ্মর শরীরেও সেই রকম এত বেশি বাণ বিদ্ধ হয়ে রইল যে, আর একটুও জায়গা খালি রইল না।

এই অবস্থায় ভীষ্ম গড়িয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। না, ঠিক মাটিতেও না, সারা শরীরের এত তির তাঁকে শুইয়ে রাখল কিছুটা উঁচুতে। একেই বলে ভীষ্মের শরশয্যা। এ রকম অবস্থায় আর কাউকেই কখনও দেখা যায়নি।

ভীষ্মর এই পতনের কথা শুনে বহু মানুষ হাহাকার করে উঠল। যুদ্ধ থামিয়ে সকলেই ছুটে এল ভীষ্মর কাছে। ভীষ্ম বললেন, "সকলকেই একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়, আমিও যাচ্ছি। তবে আমার

ইচ্ছামৃত্যুর বর আছে। আমি ইচ্ছে না করলে আমাকে সরাবার সাধ্য কারও নেই। আমি বেশ একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে দু' চক্ষু বুজব। অর্থাৎ আমি এই অবস্থাতেও থাকব কিছুদিন।"

তারপর তিনি বললেন, "আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। কেউ আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো?"

সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে ছুটে গিয়ে নানারকম পাত্রে নানারকম সুগন্ধী পানীয় নিয়ে এল। ভীষ্ম তার কোনওটাই ছুঁয়ে দেখলেন না। তিনি তাকালেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে একটা বিশেষ তিরে বিদ্ধ করলেন সেখানকার মাটি। অমনি সেখান থেকে উঠে এল একটা নির্মল জলের ফোয়ারা। তা গিয়ে পড়ল ভীষ্মর মুখে। তিনি তৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন। তারপর সকলকে বললেন, "তোমরা যাও। যার-যার কর্তব্য পালন করো।"

অর্থাৎ ভীষ্ম এই যুদ্ধে নিহত হলেন না বটে, তবে যোদ্ধা হিসেবেও তাঁর আর যোগ্যতা রইল না।

॥ ১২ ॥

এই সাংঘাতিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে কৌরবদের সেনাপতি ভীষ্ম বারবার অপমান করেছেন কর্ণকে। সকলের সামনে। তিনি কর্ণ সম্পর্কে এমন কথাও বললেন, যোদ্ধা হিসেবে কর্ণ এমন কিছু বড় নয়, বড় বড় বীরদের তুলনায় কর্ণের ক্ষমতা অর্ধেকের মতন।

বারবার এ রকম কথা শুনে একসময় খেপে উঠলেন কর্ণ। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "ভীষ্ম যতদিন সেনাপতি থাকবেন, ততদিন আমি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরব না, এ রকম সভাতেও আসব না। এঁর মৃত্যুর পর আমি যুদ্ধ করতে আসব, তখন সবাই দেখবে আমার পরাক্রম।"

ভীষ্ম মোটেই সত্যি কথা বলেননি। সারা দেশেই অনেকে কর্ণকে একজন প্রধান বীর বলে মনে করে। কেউ-কেউ মনে করে, এমনকী অর্জুনও তাঁর সমকক্ষ নন।

কর্ণ দুর্যোধনের বন্ধু আর পাণ্ডবদের সঙ্গে লড়াই করার চিন্তায়

দুর্যোধন সব সময় নির্ভর করেছেন কর্ণের উপর। এখন এই নিদারুণ যুদ্ধের সময় কর্ণ থাকবেন না তাঁর পাশে? এ আবার হয় নাকি? এ রকম সময় দুর্যোধন ও আরও অনেকে দৌড়ে গিয়ে কর্ণকে ধরে ফেলে, তাঁকে ভাল-ভাল কথা শুনিয়ে ফিরিয়ে আনাই কি উচিত ছিল না?

কিন্তু ভীষ্ম আর কর্ণর ঝগড়া এমন এক পর্যায়ে এসেছে, কর্ণকে ফিরিয়ে আনলে ভীষ্মও হয়তো বলে উঠবেন যে, কর্ণ দলে এলে তিনিও যুদ্ধ না করে অস্ত্র ত্যাগ করবেন। তখন তো মহাগোলমাল শুরু হয়ে যাবে। তাই পিতামহ ভীষ্মের সম্মানরক্ষার জন্য দুর্যোধন তাঁকেই মান্য করলেন।

তারপর তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, কর্ণকে বাদ দিয়ে। এ জন্য কৌরবদের যে কতখানি ক্ষতি হল, তা বুঝল না কেউ? কর্ণ যদি প্রথম থেকেই কৌরবদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতেন, তা হলে গোটা যুদ্ধটারই গতি অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারত। তা তো হলই না, এর মধ্যে যুদ্ধ চলল দশ দিন। এই দশ দিনে দু'পক্ষেরই ক্ষতি হল অনেক। এই দশদিন কর্ণ ঘুরেছেন যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশে, সব খবর শুনেছেন, কিন্তু নিজে অস্ত্র ধরেননি।

এখন ভীষ্মর পতন হয়েছে, এখন তো যুদ্ধে অংশ নিতে কর্ণর কোনও বাধাই রইল না। অনেক কৌরবসৈন্য কর্ণের নাম ধরে

চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। এখন তাঁদের কাছে কর্ণই সবচেয়ে বড় ভরসা। পাণ্ডবরাও তাঁকে ভয় পান।

কর্ণ যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে কর্ণ প্রথম যে কাজটা করলেন, তাতে আশ্চর্য হতেই হয়। তিনি গেলেন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মর কাছে। তখন আর কাছাকাছি কেউ নেই। ভীষ্ম তখন ঝিমিয়ে রয়েছেন। কর্ণ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি রাধা ও অধিরথের পুত্র কর্ণ। আমি কোনও দোষ করিনি, তবু আপনি আমার উপর সব সময় বিদ্বেষ করেছেন। তবু আমি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য অনুমতি চাইতে এসেছি।"

অতিকষ্টে চোখ মেলে ভীষ্ম দেখলেন কর্ণকে। তাঁকে আরও কাছে ডেকে এনে ভীষ্ম সস্নেহে বললেন, "তুমি তো রাধা আর অধিরথ নামে শূদ্রদের পুত্র নও। আমি নারদের কাছে শুনেছি, তুমি কুন্তীর সন্তান, তুমি ক্ষত্রিয়। তুমি পাণ্ডবদের বড় ভাই।"

কর্ণ বললেন, "আমার এই শূদ্র মা-বাবাকেই আমি মানি। এঁরা খুব শিশুকাল থেকেই সব রকম যত্নে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমার আর অন্য পরিচয় দরকার নেই।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি আরও জেনেছি, তুমি একজন অসাধারণ যোদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার তুলনা করা যায়, তুমি বেদ পাঠ করেছ, প্রচুর দান-ধ্যান করে থাকো। তবু আমি মাঝে-মাঝেই

তোমাকে অপমান করেছি। তা তোমার তেজ কমিয়ে দেওয়ার জন্য। তুমি দুর্যোধনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার অনেক অন্যায়কে সমর্থন করেছ। কিন্তু তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তার জন্য আমি খুশি হয়েছি। তোমার উপর এখন আমার আর রাগ নেই। তুমি যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছ, যাও। মনে রেখো, পাণ্ডবরা তোমার মায়ের পেটের ভাই, তুমি কৌরবপক্ষে থেকেও ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, দু'পক্ষকেই এক জায়গায় মিলিয়ে দাও, ভাইয়ে-ভাইয়ে এই নিদারুণ অর্থহীন যুদ্ধ দু'টি পরিবারেরই যে ধ্বংস ডেকে আনবে। আমার পতনেই এই যুদ্ধের অবসান হোক। অনেক রাজা আর প্রচুর সাধারণ মানুষ এ জন্য প্রাণে বেঁচে যাবে।"

কর্ণ বললেন, "আপনি যা বললেন, তা একেবারে ঠিক। আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু পিতামহ, এই যুদ্ধ থামাবার ক্ষমতা আমার নেই। দুর্যোধন যেন নিয়তির টানে ছুটে চলেছে সর্বনাশের দিকে। এই যুদ্ধে দু' পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মোটেই জয়ী হওয়ার আশা করি না। তবে, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মৃত্যু বরণ করার বদলে আমাদের মতন যোদ্ধারা যদি সংগ্রাম করতে-করতেই মৃত্যু বরণ করে, সেটাই আমাদের পক্ষে সত্যিকার গৌরবের ব্যাপার। আমি সে জন্যই এসেছি। আমার অস্থির স্বভাবের জন্য হঠাৎ-হঠাৎ আপনাকে কিছু কটু কথা বলেছি, সে জন্য আমায় ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বললেন, "এ যুদ্ধ থামাবার সাধ্য এখন আর কারও নেই। আমিও তো আগে কত চেষ্টা করেছি, একটুও সফল হতে পারিনি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ থামাবার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা খুবই যুক্তিযুক্ত। তবু কেউ তা মানেনি। তুমি যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছ, যাও। নিয়ম নীতি মেনে যুদ্ধ করো, শিগগিরই যাতে তুমি স্বর্গে যেতে পারো, আমি তোমায় সেই আশীর্বাদ করছি।"

ভীষ্মকে আবার প্রণাম করে কর্ণ ছলছল চোখে নিজের রথে উঠে চলে গেলেন দুর্যোধনের কাছে।

কৌরবপক্ষের অনেকেই আশা করেছিলেন, ভীষ্মর পর কর্ণই হবেন সেনাপতি। কিন্তু কর্ণ তাতে রাজি নন। দুর্যোধন এ ব্যাপারে কর্ণর পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, "আমাদের পক্ষে এমন বেশ কয়েকজন আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। তবে, তাঁদের একজনকে সেনাপতি হিসেবে বরণ করলে অন্যরা ক্ষুব্ধ হবেন, কিংবা দুঃখিত হবেন। তাই আমার মতে, অস্ত্রগুরু দ্রোণই হোন সেনাপতি। তাঁর বয়স সকলের চেয়ে বেশি, আর এখানে অনেকেই তাঁর শিষ্য। কেউ এতে আপত্তি করবে না।"

দ্রোণ রাজি হলেন। তিনিই হলেন কৌরবদের দ্বিতীয় সেনাপতি।

আবার যথারীতি যুদ্ধ শুরু হবে, তার আগে দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন, "তুমি মহামতি ভীষ্মর পতনের পর আমাকে সেনাপতিত্ব

দিয়ে সম্মান জানিয়েছ। এ জন্য আমি খুশি হয়েছি তো বটেই। এখন তুমি আমার কাছে একটা বর চাও।”

দুর্যোধন বললেন, “হে গুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি যদি আমাকে বর দিতেই চান, তা হলে যুধিষ্ঠিরকে জ্যান্ত অবস্থায় আমার কাছে ধরে এনে দিন।”

এ-কথা শুনে দ্রোণ খুব অবাক হলেন, খুশিও হলেন। ধন্য যুধিষ্ঠির। তিনি এমনই একজন মহৎ মানুষ যে, তাঁর প্রধান শত্রুও তাঁকে হত্যা করতে চায় না। বাঁচিয়ে রেখে শুধু ধরে আনতে চায়।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম কিছুই নয়। যুধিষ্ঠির কতটা মহৎ চরিত্র, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চান না দুর্যোধন। আসলে তিনি একটা মতলব এঁটেছেন। দুর্যোধন বেশ ভাল করেই জানেন যে, কোনও ক্রমে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে পারলে তাঁদের বিপদ আরও বেড়ে যাবে। পাণ্ডবদের অন্য চার ভাই তাঁদের দাদাকে এতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে যে, যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু-সংবাদ পেলে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়ে কৌরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আর সেই পাণ্ডবদের মধ্যেই রয়েছেন ভীম ও অর্জুনের মতন অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা! তার চেয়ে অনেক সহজ হবে যুধিষ্ঠিরকে ছিনিয়ে আনা। তাঁর উপর কোনও অত্যাচার করা হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় দেখানো হবে। তারপর তাঁকে অনুরোধ করা হবে, আর একবার

পাশা খেলার জন্য। যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাবে কখনও "না" বলেন না। তিনি খেলতে বসবেন, আর আগের বারের মতনই হারতে থাকবেন। প্রত্যেকটা খেলায় হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হবেন। তখন খেলার শর্ত অনুযায়ী চার ভাই ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বাধ্য হবেন বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে। তারপরেও এক বছর অজ্ঞাতবাস। অত বছর পর আর তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। আর এ জন্য কৌরব পক্ষকেও কেউ দোষ দিতে পারবে না, যুধিষ্ঠির নিজেই খেলতে রাজি হবেন আর হারবেন, আর এসবের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

দুর্যোধন তাঁর এই মতলবের কথা চেপে রাখতে পারলেন না। বলে ফেললেন দ্রোণের সামনে। দ্রোণ এখন কী করবেন, তিনি যে দুর্যোধনকে একটা বর দেওয়ার কথা দিয়ে ফেলেছেন? এখন তা আর ফেরানো যায় না।

দ্রোণ তখন বললেন, "রাজা, তুমি চাও যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনি। সে দায়িত্ব আমি অবশ্যই পালন করব, তবে আমার কিছু অক্ষমতার কথাও তোমাদের জানিয়ে রাখি। অর্জুন যদি সর্বক্ষণ যুধিষ্ঠিরের পাশে-পাশে থাকে, তা হলে সেই অবস্থা থেকে যুধিষ্ঠিকে উঠিয়ে আনার সাধ্য আমারও নেই। অর্জুন আমার শিষ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু তারপরেও সে ইন্দ্র আর অন্য অনেক দেবতার কাছ থেকে

প্রচুর নতুন অস্ত্র পেয়েছে। তার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করলে আমি কিছুতেই তাকে হারাতে পারব না। বরং তোমরা এক কাজ করো, অনেকে মিলে যে-কোনও ছুতোয় তোমরা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যদিকে নিয়ে যাও, যুধিষ্ঠির যদি একটুক্ষণের জন্যও ফাঁকা থাকেন, তাঁকে অন্য বীররাও ঘিরে থাকলেও আমি তাদের গ্রাহ্য করি না। আমি ঠিক যুধিষ্ঠিরকে তুলে এনে তোমার হাতে দেব। তোমাদের কাছ থেকে আমি শুধু এইটুকু সাহায্য চাই।"

দুর্যোধন ভাবলেন, কিছুক্ষণের জন্য অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। গুরু দ্রোণ যখন কথা দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে, যুধিষ্ঠির এবার সত্যি-সত্যি ধরা পড়বেন।

যে-কোনও বড় যুদ্ধের সময় দু'পক্ষেই অনেক গুপ্তচর ঘোরাঘুরি করে। তারা অন্যরকম সেজে অন্য পক্ষের অনেক গোপন খবর জেনে নেয়। সেই রকমই এক গুপ্তচর কৌরবশিবির থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিল সব।

যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বললেন, "তুমি তো শুনলে গুরু দ্রোণের শপথের কথা। একমাত্র তুমি ছাড়া তিনি অন্য কোনও যোদ্ধাকে গ্রাহ্যই করেন না। সেই জন্য, আজ সারাদিন তুমি আমার পাশে-পাশেই থাকো। গুরু দ্রোণকে কোনও সুযোগ দিয়ো না।"

অর্জুন বললেন, "গুরু দ্রোণকে আমি কিছুতেই হত্যা করতে পারব না, আবার আপনার পাশ ছেড়েও কোথাও যাব না। আমি আমার অস্ত্রগুরুর সঙ্গে লড়াই করব ঠিকই, আর আপনাকে কেউ এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে, সে প্রশ্নই ওঠে না।"

সুতরাং দু'পক্ষেরই এই মনের ভাব নিয়ে শুরু হল যুদ্ধ। আজ এগারো দিন।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। দুই পক্ষেই যেসব বড়-বড় বীর যোদ্ধা রয়েছেন, তাঁদের বয়স কিন্তু কম নয়। ষাট কিংবা তারও বেশি হতে পারে। দ্রোণের বয়স ছিয়াশি। ভীমের, অর্জুন, দুর্যোধন, কর্ণেরও বড়-বড় ছেলে আছে, তাদের কেউ-কেউ এই যুদ্ধে অংশ নিতে নেমে পড়েছে। তাদের মধ্যে অর্জুনের প্রিয় সন্তান অভিমন্যু বেশ বিখ্যাত।

এদিনের যুদ্ধে কৌরবরা অনেক চেষ্টা করেও যুধিষ্ঠিরের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেন না। অর্জুন ছাড়াও ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আরও অনেকে ঘিরে রাখলেন যুধিষ্ঠিরকে। সন্ধের সময় যুদ্ধ শেষ হলে দুই দলই নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন গোমড়া মুখে। কৌরবপক্ষের অনেকেই আশা করেছিলেন যে, সেদিনই যুধিষ্ঠির সম্পর্কে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবেন দ্রোণ। আর পাণ্ডবদের পক্ষে অনেকেই ভাবছিলেন, সবাই মিলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে থাকলে অন্যদিকে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অনেক।

সন্ধের পর দু'দিকের শিবিরেই প্রধান পুরুষরা আলাপ-আলোচনা করতে বসেন। দ্রোণ ম্লান মুখে দুর্যোধনকে বললেন, "আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, আজই যুধিষ্ঠিরকে ধরে নিয়ে আসব। কিন্তু আমি তা পারিনি। তবে তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, অর্জুন পাশে থাকলে দেবতাদেরও সাধ্য নেই যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করার। তোমরা তো অর্জুনকে দূরে সরিয়ে দিতেও পারলে না!"

তখন ত্রিগর্ত নামে একটি দেশের রাজা এগিয়ে এসে বললেন, "কাল থেকে আমরা এ দায়িত্ব নিতে পারি। অর্জুন আমাদের রাজ্যের প্রতি অনেক অবিচার করেছেন, রাজা সুশর্মা ও তাঁর ভাইদের অপমান করেছেন বারবার, সেই সব কিছুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আজ তাঁরা জীবনপণ করতে চান। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন সংসপ্তক আর নারায়ণী নামে অতি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, এঁরা যুদ্ধে নামার আগেই শপথ করেন, জয়ী হতে না পারলেও এঁরা কখনও রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান না, জীবন-মরণ সংগ্রাম করেন, সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।"

প্রশ্ন হল, এঁরা অর্জুনকে কীভাবে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবেন? অর্জুন এঁদের কথা শুনবেন কেন?

সুশর্মা তখন বললেন, "তার একটা সহজ উপায় আছে। অর্জুনের একটা শপথ আছে, কেউ যদি একেবারে অর্জুনের সামনে গিয়ে

সরাসরি যুদ্ধে আহ্বান করে, অর্জুন তাকে অগ্রাহ্য করেন না। তার যুদ্ধ-সাধ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য লড়ে যান। আমরাও কাল সকালে অর্জুনের কাছে গিয়ে এই আহ্বান জানাব। অর্জুন যুদ্ধ শুরু করলে আমরা বেশ কয়েকজন নানা দিক থেকে আক্রমণ করব তাঁকে। এতে অর্জুন খানিকটা বিভ্রান্ত তো হবেনই। কাকে ছেড়ে কাকে আক্রমণ করবেন? আমরা তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাব, সেই অবসরে আপনারা যুধিষ্ঠিরকে ধরে নিতে পারবেন।”

গুপ্তচররা কৌরবশিবিরের এই সব গোপন কথাও জানিয়ে দিল পাণ্ডবদের।

পরদিন সকালেই ত্রিগর্তের রাজা ও অন্য কয়েকজন অর্জুনের শিবিরের সামনে শুরু করে দিলেন হইহল্লা।

অর্জুন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে প্রথমেই গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তাঁকে প্রণাম করতে আর অনুমতি নিতে।

যুধিষ্ঠির বললেন, “আচার্য দ্রোণ চান আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কৌরবশিবিরে বন্দি করে রাখবেন। সেটা যাতে ওঁরা না পারেন, সেই ব্যবস্থা করার ভারও তোমারই উপরে। এখন তুমি কী করবে, তা নিজেই ঠিক করো।”

অর্জুন বললেন, “আমি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, যে-কেউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে তাকে ফেরাব না। তবে, আমি

কিছুক্ষণ না থাকলেও পাঞ্চাল রাজ্যের বীর সত্যজিৎ সব সময় আপনার গায়ে সেঁটে থাকবে। সত্যজিৎ নিজেও বড় যোদ্ধা, আরও অনেকে তো তাকে সাহায্য করবে। যদি সত্যজিৎ হঠাৎ নিহত হয়, তখন আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি তখন রণক্ষেত্র ছেড়ে আপনার শিবিরে বিশ্রাম নিতে যাবেন। এর মধ্যে তো আমি এসেই পড়ছি।”

যুদ্ধের সময়, কোথায় কারা মুখোমুখি হয়ে লড়ছে, কে নিহত হল, কে নিজেকে জয়ী মনে করল, কে কোন অস্ত্র ব্যবহার করছে, এই সবই সঞ্জয় শোনাতে লাগল অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে। কিন্তু আমাদের অত খুঁটিনাটি জানার দরকার নেই। অনেক যুদ্ধ তো একই রকম, সব নামও আমরা মনে রাখতে পারব না, বড়-বড় ঘটনাগুলো জানলেই হল।

যুদ্ধের ইতিহাস যখন লেখা হয়, তাতে সাধারণ পদাতিক সৈন্যদের কারও নামই থাকে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই এই পদাতিক সৈন্যরাই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে দেয়। এখানেই সংসপ্তক আর নারায়ণী সৈন্যরা এত হিংস্রভাবে আক্রমণ চালাচ্ছেন, যাতে মনে হয়, আর দু’-এক দিনের মধ্যেই পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনী হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথবা প্রাণভয়ে পালাবে।

সেই জন্যই অর্জুন প্রথমে ত্রিগর্তের রাজা ও তাঁর ভাই-টাইদের

যমের বাড়ি পাঠালেন, তারপর প্রবল বিক্রমে সংহার করতে লাগলেন ওই দুই বাহিনীর সৈন্যদের।

মোট কথা, আজ সারাদিন যুদ্ধে কী ফলাফল পাওয়া গেল? দু'পক্ষেরই কয়েকজন বীর সংগ্রামে নিহত হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সারাদিনের মধ্যে কৌরবদলের কেউই যুধিষ্ঠিরের গায়ে একটি আঁচড়ও কাটতে পারলেন না।

একসময় সমস্ত আকাশ নানা রঙে রাঙিয়ে সূর্যাস্ত হতে লাগল। নিঃশব্দে নেমে এল সন্ধে। শেষ হল আর একটা দিন।

পরের দিনটাই তেরো দিনের দিন। সকাল থেকেই দ্রোণ তাঁর সৈন্যদের বিশেষ ভাবে সাজাতে বসালেন। এর নাম ব্যূহ। এই ব্যূহও নানারকম হয়, নামও হয় অনেক রকম। দ্রোণ যেটি বানালেন, তার নাম চক্রব্যূহ। বাইরে থেকে এর মধ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন; কিন্তু ভিতরে যারা রয়েছে, তারা অনায়াসে সেখান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। সেটাই খুব বিপদের কথা।

যুধিষ্ঠির অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুকে বললেন, "বৎস, এই যে ওরা চক্রব্যূহ বানিয়েছে, এর মধ্যে ঢোকার কোনও কৌশল আমরা অনেকেই জানি না। শুধু জানে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন আর তুমি। বাবার কাছ থেকে তুমিই তা শিখেছ। এখন তুমি আমাদের পথ দেখাও, আমরা তোমার পিছু-পিছু যাব।"

অভিমন্যু তো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। সে বলল, “আমি অবশ্যই আপনাদের জন্য পথ বলে দেব। তবে, একটা কথা আছে। বাবা আমাকে এর ভিতরে ঢোকার কৌশলটাই শিখিয়েছেন, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতিটা তিনি এখনও আমাকে শেখাবার সময় পাননি। আপনাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে যদি কোনও বিপদ হয়...”

ভীম বললেন, “বৎস, তুমি শুধু আমাদের জন্য এই ব্যূহের দ্বার খুলে দাও। আমি, সাত্যকি, আরও যাঁরা রয়েছেন, সবাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ব। তারপর ওদের যাকে পাব তাকেই খতম করব, আর এই ব্যূহটাই ভেঙে-চুরে লন্ডভন্ড করে দেব। তখন আর ফেরার পথ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।”

অভিমন্যু তখন আনন্দে ঝলমল মুখে একটা হাত তুলে বলল, “চলুন তবে, আর দেরি করার কোনও দরকার নেই। শুরু হোক, শুরু হোক, আসুন!”

অভিমন্যু তার রথ চালিয়ে দিল সেই ব্যূহের প্রবেশপথের দিকে।

॥ ১৩ ॥

সঞ্জয় এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে প্রাসাদের অলিন্দে বসে আছেন, সেখান থেকে সামনের যুদ্ধক্ষেত্রটিকে মনে হয় মহাসমুদ্রের মতো। অসংখ্য সৈন্য সেখানে যুদ্ধে মেতে আছে। কোথায়, কে, কার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করছে, তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু সঞ্জয় তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সবকিছুই দেখতে পারেন।

সঞ্জয় একটু পরে থেমে যেতেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে কিছুটা অভিযোগের সুরে বললেন, "বৎস, আমার মনে হয়, পাণ্ডবদলের প্রতিই তোমার পক্ষপাতিত্ব আছে! কৌরবপক্ষের কত বড়-বড় বীর যোদ্ধা এর মধ্যেই নিহত হয়েছেন, তা বলে কি পাণ্ডবপক্ষের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? পাণ্ডবপক্ষের কোনও মহান যোদ্ধা কি নিহত হননি?"

সঞ্জয় বললেন, "হে মহারাজ, এই মহাযুদ্ধের কী যে ভয়ংকর রূপ, তা তো সব একসঙ্গে বলা যায় না! তাই আমি বেছে-বেছে আপনাকে মূল ঘটনাগুলো শোনাচ্ছি। পাণ্ডবপক্ষেরও বেশ কিছু যোদ্ধা এর

মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। আপনি তো জানেন, অনেকবারই শুনেছেন, যে পক্ষে ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণের মতন মহাবীরেরা রয়েছেন, এঁদের পরাজিত করা তো দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার আগে কত মানুষকে যে প্রাণ দিতে হবে, তার ইয়ত্তা নেই।”

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “ঠিক আছে, তুমি আবার আমাকে জানাতে শুরু করো। অর্জুনের ছেলে নাকি দারুণ সংগ্রাম করছে? সে এখন কোথায়?”

সঞ্জয় বললেন, “সে-ই এখন যুদ্ধের প্রধান নায়ক। এ রকম বিস্ময়কর ব্যাপার আগে কেউ কখনও শোনেওনি, দেখেওনি। অভিমন্যুর বিরুদ্ধপক্ষীয় সৈন্যরা অবাক হয়ে দেখছে তার যুদ্ধ-নৈপুণ্য। কেউ-কেউ যুদ্ধ থামিয়ে প্রশংসা করতে শুরু করেছে অভিমন্যুর। তার অমন চেহারা, অত কম বয়স, তবু তার তেজের কাছে কৌরবপক্ষের বড়-বড় বীরেরাও দাঁড়াতে পারছেন না।”

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন, “এখন সে যুদ্ধ করছে কার সঙ্গে?”

সঞ্জয় বললেন, “আজ দেখছি, পাণ্ডব এবং কৌরবপক্ষে প্রধান বীরপুরুষদের সন্তানেরাই যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এসেছে এবং বীরত্ব দেখাচ্ছে। যেমন, দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, সেও তো একজন মহাবীর, তবু অভিমন্যু একসময় তার প্রাণ হরণ করল!”

এ-কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের চোখে জল এসে গেল।

সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ, এখন তো দেখছি, অভিমন্যু যেমন যুদ্ধে অসম্ভব প্রতাপ দেখাচ্ছে, তেমনই সে আবার এই ব্যূহ থেকে বেরোবার পথও খুঁজতে চাইছে। আমরা তো জানি যে, অভিমন্যু তার বাবার কাছ থেকে এই ব্যূহে ঢোকার কৌশল শিখে নিয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার কৌশলটা শেখার সময় পায়নি।"

তারা ভেবেছিল, ভীম এবং অন্য যোদ্ধারা অভিমন্যুর সঙ্গে-সঙ্গে এই ব্যূহের মধ্যে ঢুকে এসে পুরো ব্যূহটাই ভেঙে তছনছ করে দেবেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। দ্রোণ, দুর্যোধন এবং কর্ণের মতো বীরেরা প্রবল প্রতাপে ওঁদের আর ভিতরেই আসতেই দেননি। অভিমন্যুর একলারই প্রতাপে কৌরবপক্ষের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছেন।

দুর্যোধন ঠিক করলেন, এখন আর অভিমন্যুকে বধ না করে উপায় নেই! অভিমন্যু যে-কোনও একটা পথে বেরোবার চেষ্টা করেই দেখতে পেলেন, সেখানে দ্রোণ বা কর্ণ বা দুর্যোধন বা অশ্বত্থামা বা কৃপ প্রমুখ কেউ না-কেউ পাহারা দিচ্ছেন সেই পথ। সকলেরই মনে হচ্ছে, এই অভিমন্যু তাঁর বাবা অর্জুনের মতনই সমান বীর। এমনকী, তিনি হয়তো তাঁর বাবাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন।

দ্রোণ তো প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, "এ রকম যুদ্ধে অভিমন্যুর

সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কি কেউ আছেন? এখন একমাত্র উপায়, অভিমন্যুকে যদি রথ থেকে নীচে নামানো যায়। যতক্ষণ সে রথের উপর থাকবে, ততক্ষণ তার কেশ স্পর্শ করার মতো যোগ্যতাও আমাদের নেই। তার রথ নষ্ট করে দিয়ে যদি এখনকার মতো যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে পরে আবার যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে।"

তা শুনে কর্ণ এবং অন্য বীরেরা অভিমন্যুর রথের সারথিকে হত্যা করলেন এবং রথটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও অভিমন্যুকে নিরস্ত করা গেল না। তিনি একটি গদা হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে এলেন নীচে। তখন দুঃশাসনের পুত্রও একটি গদা হাতে এগিয়ে এলেন মুখোমুখি অভিমন্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য।

অনেকেরই ধারণা, যে সাত জন মহারথী মিলে একসঙ্গে হত্যা করেছেন অভিমন্যুকে। তা অবশ্য ঠিকই।

তাঁকে ঘিরে ধরেছেন ছ'জন। তাঁদের কারওরই মৃত্যুবাণ অভিমন্যুর বুকে বেঁধেনি। অভিমন্যুর সঙ্গে শেষ লড়াইটা হয়েছিল দুঃশাসনের ছেলের। রক্তাক্ত শরীরে অনেক ক্লান্তি নিয়েও অভিমন্যু গদাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় দুঃশাসনের ছেলে তাঁর মাথায় প্রবলভাবে একটা আঘাত করতেই তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। সেটাই তাঁর শেষনিশ্বাসের সময়।

দুঃশাসনের যে পুত্রটি শেষ পর্যন্ত অভিমন্যুকে মারেন, তাঁর নাম আমরা জানি না। কাহিনিকার ঋষি বেদব্যাস সেই নামটি আমাদের জানাতে ভুলে গিয়েছেন।

তার কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল সেদিনের যুদ্ধ। অর্জুন তখনও ব্যস্ত ছিলেন সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে। তিনি কিছুই জানতে পারলেন না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আজকের মতো যুদ্ধের বিরতি। তাই অর্জুন আর কৃষ্ণ ফিরে চললেন তাঁদের শিবিরের দিকে। যেতে-যেতে অর্জুন একবার কৃষ্ণকে বললেন, "দ্যাখো সখা, অন্যদিন এই সময় কত রকম আওয়াজ শোনা যায়। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ গান গায়, কেউ অস্ত্রে শান দেয়। কিন্তু আজ যেন সব দিকই থমথম করছে। কোনও আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না। কী ব্যাপার বলো তো!"

কৃষ্ণ বললেন, "তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। চলো, শিবিরে পৌঁছই, আজকের সব বৃত্তান্ত জানতে পারা যাবে।"

অর্জুনের রথ নিজের শিবিরের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, অনেকেই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। অনেকে দু' হাত মুখে চাপা দিয়ে বসে আছে। তারপর যুধিষ্ঠির এবং অন্য প্রধান পুরুষদের দেখে অর্জুনের বুক কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই আজ এদিকের রণক্ষেত্রে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে!

অন্যদিন অভিমন্যু এই সময় তাঁর বাবার জন্য অপেক্ষা করে

থাকেন। আজ তিনি কোথায়! তাঁকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না!

একটুক্ষণের মধ্যেই অর্জুন জানতে পারলেন, সেদিনের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। অভিমন্যু অর্জুনের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। তিনি আর বেঁচে নেই। এটা অর্জুন সহ্য করবেন কী করে?

তখন অর্জুনও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে প্রবলভাবে কাঁদতে লাগলেন। সকলে মিলে অর্জুনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যুদ্ধ তো এখনও শেষ হয়নি! আগামীকাল হয়তো আরও ঘোর যুদ্ধ হবে। এই সময় অর্জুন যদি ভেঙে পড়েন, তা হলে পাণ্ডবপক্ষের জয়ের আশা তলিয়ে যাবে।

সেই জন্যই সকলে মিলে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বললেন যে, "অভিমন্যু শেষ পর্যন্ত বীরের মতো লড়াই করতে-করতে প্রাণ দিয়েছেন। যে-কোনও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এটা খুবই গৌরবের কথা। অভিমন্যু নিশ্চয়ই এরই মধ্যে স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছেন।"

অর্জুন একসময় শোক সামলে নিয়ে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কাল আমি জয়দ্রথকে নিশ্চিত হত্যা করব। কাল সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে জয়দ্রথকে মেরে আমি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেব।"

কৌরবপক্ষে বড়-বড় বীরদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে অর্জুন পরাঙ্মুখ নন, তবু হঠাৎ শুধু জয়দ্রথের কথা বললেন কেন?

এর আগে আমরা সপ্তরথীর ছ'জনের কথা জেনেছি। জয়দ্রথই

হচ্ছেন তার সপ্তম। আর এই জয়দ্রথ অভিমন্যুকে বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করেছেন। বলা যায়, তাঁর তৎপরতাতেই অভিমন্যু কিছুতেই বেরোতে পারেননি সেই ব্যূহ ভেঙে। সুতরাং জয়দ্রথকেই বলা যায়, অভিমন্যু হত্যার প্রধান উদ্যোগী।

এ ছাড়াও জয়দ্রথের উপর আগে থেকেই অর্জুনের খুব রাগ ছিল।

কৌরবরা একশো, আর পাণ্ডবেরা পাঁচজন। এই একশো-পাঁচজন ভাইয়ের সঙ্গে ছিল একটি মাত্র বোন, তাঁর নাম দুঃশলা। সেই দুঃশলার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে জয়দ্রথের। এই জয়দ্রথ লোকটি একটি দেশের রাজা এবং সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও জানেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে মোটেই ভাল নন। তাঁর ছোটখাটো অনেক অন্যায় ভাইদের চোখে পড়েছে। তবু তাঁরা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একবার তো জয়দ্রথ এমন কাণ্ড করেছিলেন যে, তক্ষুনি অর্জুন বা ভীম তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। তখন পাণ্ডবেরা নির্বাসনের মধ্যে জঙ্গলে ঘুরছেন। রাত কাটাচ্ছেন কোনও কুটিরে। সেদিন পাঁচ ভাই-ই গিয়েছেন শিকার বা অন্য কোনও কাজে। তারই মধ্যে জয়দ্রথ এসে পড়ে দ্রৌপদীকে জোর করে নিজের রথে তুলে নেন।

তিনি বারবার বলতে থাকেন, দ্রৌপদীর মতন রূপসি সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখেননি। দ্রৌপদীর তুলনায় অন্য সব নারীকেই মনে হয় মেয়ে-বাঁদরের মতন। সুতরাং দ্রৌপদীকে তাঁর চাই-ই চাই।

দ্রৌপদী অবশ্য এই ঘটনায় ভয় পাননি। তিনি তেজের সঙ্গে বারবার জয়দ্রথকে জানিয়েছিলেন, তাঁর পাঁচজন স্বামী যখন এই ব্যাপারটা জানতে পারবেন, তখন জয়দ্রথের যে কী অবস্থা হবে, তা তিনি নিজেই কল্পনা করতে পারবেন না!

যথাসময়ে পঞ্চপাণ্ডব এই ঘটনা জানতে পেরে জয়দ্রথের রথ আটকে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড ক্রোধে ভীম বা অর্জুন তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথকে কুচিকুচি করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু ভীম আর অর্জুন রাগে ফুঁসতে থাকলেও যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তাঁরা নিরস্ত হলেন। কারণ, জয়দ্রথ নিহত হলে তাঁদের বোনও যে বিধবা হয়ে যাবে। জামাই বলে কথা! অনেক পরিবারেই জামাইদের কিছু-কিছু বায়নাক্কা বা অপরাধ মেনে নিতেই হয়। কিন্তু আজ আর সেই পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই নেই।

সেইজন্যই অর্জুন বারবার বলতে লাগলেন, কাল সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথকে হত্যা করবেন। আর যদি তা না পারেন, তা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন নিজেই।

যথাসময়ে গুপ্তচরদের মুখে অর্জুনের এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার কথা পৌঁছল এসে কৌরবশিবিরের কাছে। তাতে অনেকে ভয় পেলেও কেউ-কেউ খুশিও হলেন। কারণ, কাল সারাদিন যদি জয়দ্রথ দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকেন, তা হলে অর্জুন আর তাঁর খোঁজই

পাবেন না। তাঁকে মারবেনই বা কী করে? সুতরাং তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন।

জয়দ্রথ অবশ্য রণক্ষেত্র ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে রাজি হতে চান না। তিনিও তো একজন রাজা! যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর খ্যাতিও আছে। সুতরাং ক্ষত্রিয় হিসেবে রণক্ষেত্র ছেড়ে তাঁর পলায়ন মোটেই শোভা পায় না। অন্য বীরেরা ঠিক করলেন, তাঁরা সব সময় অর্জুনের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে ব্যস্ত রাখবেন, যাতে তিনি নিতে না পারেন এই চরম প্রতিশোধ।

সেরকমই ঘটতে লাগল পরের দিন।

অর্জুন কিছুতেই সুযোগ পেলেন না জয়দ্রথের মুখোমুখি হওয়ার। ক্রমশ দিনের আলো কমে এল। আকাশের দিকে তাকালেই মনে হয় সন্ধ্যা আসন্ন। সত্যি-সত্যিই সন্ধ্যা এসে গেল।

এর পর তো যুদ্ধ থেমে যাওয়ার কথা।

কৌরবদল আনন্দে ধ্বনি দিতে লাগলেন। জয়দ্রথও দেখা দিলেন প্রকাশ্যে। অর্জুন এখন কী করবেন? তিনি কি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এখন যাবেন আত্মহত্যা করতে?

অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ বললেন, "সখা, এবার তুমি ওই পাপী জয়দ্রথকে হত্যা করো।"

অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, সেটা কী করে সম্ভব! তাঁর

প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তো দিন শেষ হয়ে গিয়েছে!

কৃষ্ণ তবু বললেন, "যাও, যাও, ওকে শাস্তি দাও।"

তখন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে লাগল। আকাশের মেঘগুলো যেন নিজেদের ইচ্ছে মতো সরে যেতে লাগল। ফুটে উঠল আবার বিকেল। সন্ধ্যা হতে যেন এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি।

কৃষ্ণ বললেন, "আমি আসলে সূর্যকে আড়াল করে রেখেছিলাম। তাই আকাশে তাকে দেখা যায়নি। অন্ধকারটাকে সবাই স্বাভাবিক বলে ভেবেছিল।"

কৌরবশিবিরেও এক দারুণ বিভ্রান্তি দেখা গেল। সূর্য আবার ফিরে এলেন! তার মানে কি, সন্ধ্যা এখনও হয়নি?

এর পর তো জয়দ্রথকে হত্যা করা অর্জুনের পক্ষে আর কিছুই নয়!

সঞ্জয়ের মুখে এই কাহিনি শুনতে-শুনতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র হতাশভাবে বললেন, "আমার পুত্ররা তো এক-এক করে মরছেই, এখন আমার জামাইটাও গেল!"

আবার পরদিন দু'পক্ষই মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধ শুরু হতেই কত রকম কোলাহল ও অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যেতে লাগল। কোথাও পরাজয়ের চিৎকার, কোথাও জয়ের হর্ষধ্বনি।

কিছুক্ষণ বাদে সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ, আমরা আগেই দেখেছি

এক-এক দিন এক-এক জন যোদ্ধা যেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রণক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়ায়। আজও তো দেখছি সেরকমই ঘটছে। যেমন, একদিন প্রধান ভূমিকা ছিল অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর। আজ দেখা যাচ্ছে, ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ সেই ভূমিকা নিয়েছে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "এই ঘটোৎকচটা কে যেন? ওকে কি আমি আগে দেখেছি?"

সঞ্জয় বললেন, "হ্যাঁ, আপনি দু'-একবার দেখেছেন। পাণ্ডবরা যখন প্রথমবার বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এটা সেই সময়কার কথা। দ্রৌপদী তখন ছিলেন না।"

হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসী এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের সামনে। তার ভাইয়ের নাম হিড়িম্ব। সেই হিড়িম্ব পাণ্ডবদের, দ্রৌপদী ও কুন্তীকে গিলে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু বেচারা তো জানত না, এই মানুষদের মধ্যে একজন রয়েছে, যার নাম ভীম। সে একশোটা রাক্ষসকেও ভয় পায় না। সুতরাং শুরু হল হিড়িম্বর সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ। বলাই বাহুল্য,সেই ঘোরতর যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চললেও শেষ পর্যন্ত ভীম ওই রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিলেন যমের বাড়ি।

হিড়িম্বা অবশ্য সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। রাক্ষসীরূপের বদলে সে এসেছে এক সুন্দরী মহিলা সেজে। সে ভীমকে দেখে এতই মুগ্ধ যে, ভীমকে বিয়েও করতে চায়। কিন্তু এরই মধ্যে যখন বোঝা

গেল যে, হিড়িম্বাও একটা রাক্ষসী, তখন ভীম তাকে হত্যা করতে গেলেন।

হিড়িম্বা এমন কান্নাকাটি শুরু করল যে, অন্যদের মনে হল, আহা, এই রমণীটি রাক্ষসী হলেও স্বভাব-চরিত্রে মানুষের মতো। সে গিয়ে কুন্তীর পায়ে পড়তেই কুন্তী তাঁর ছেলেকে বললেন, "বাবা ভীম, এই মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তুই ওকে বিয়ে করে ফ্যাল।"

মায়ের যে-কোনও কথাই আদেশের মতো। তাই ভীম কুন্তীর বাক্য উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী। কিন্তু সেকালের রীতি অনুযায়ী, এঁদের দু'-চার জন স্ত্রী থাকায় কোনও বাধা ছিল না।

তারপর একসময় এঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়।

মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রাক্ষস কিংবা দেবতাদের কোনও সন্তান জন্মালে তাদের সুদীর্ঘকাল শৈশব কাটাতে হয় না। জন্মের অল্প সময় পরেই তারা সাবালক হয়ে যায়।

হিড়িম্বার সেই সন্তানটি ভীমের দিকে তাকিয়ে বিনীত ভাবে বলল, "বাবা, আপনারা এই জঙ্গলের বাইরে গেলে, আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু আমি চিরকাল আপনাকে মনে রাখব। যখনই আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে, আমি এসে দাঁড়াব আপনার

পাশে। আর কোনও কিছু লাগবে না। শুধু আমার কথা চিন্তা করলেই হবে।”

মহারাজ, সেই ছেলেটির নামই ঘটোৎকচ। এত বড় যুদ্ধের খবর তো সবদিকেই পৌঁছে যায়। তাই ঘটোৎকচ এসে দাঁড়িয়েছে তার বাবার পাশে। ছেলেটি বেশ নম্র, ভদ্র। কিন্তু চেহারা দেখলেই শত্রুপক্ষের ভয় করে। সে অন্য সব মানুষের তুলনায় অনেক লম্বা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। ভয় হয় সত্যিই। আর সে যে যুদ্ধবিদ্যাতেও এতখানি দক্ষ, সেটাও আগে অনেকের জানা ছিল না।

আজ সে এমন ভাবে সমস্ত রণক্ষেত্র জুড়ে দাপট দেখাতে লাগল, যেন কেউ-ই তার মুখোমুখি হতে পারছে না! এমনকী, বড়-বড় যোদ্ধারাও তার সঙ্গে টক্কর দিতে পারলেন না বেশিক্ষণ। এক-এক সময় মনে হল যে, ঘটোৎকচই বুঝি আজকের যুদ্ধে সবাইকে শেষ করে দেবে।

তাই দুর্যোধন কর্ণর কাছে গিয়ে বললেন, “বন্ধু, তুমি ছাড়া তো আর কেউ এই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলতে পারবে না। আজ একে থামাতে না পারলে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনব।”

কর্ণর আসল যুদ্ধ তো হবে অর্জুনের সঙ্গে। তাই কর্ণ ভীমের ছেলের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মনে-মনে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তবু দুর্যোধনের অনুরোধে তিনি সম্মুখীন হলেন ঘটোৎকচের। কিছুক্ষণ

ঘোর যুদ্ধের পরেও কর্ণ দমন করতে পারলেন না ঘটোৎকচকে।

তখন কর্ণ একটি বিশেষ বাণ সরাসরি ঘটোৎকচের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। তাতেই ধরাশায়ী হয়ে গেল ঘটোৎকচ। তার অত বড় মৃতদেহের চাপে পড়েও মৃত্যু হল কৌরবপক্ষের অনেক সেনার। এত বড় একজন শত্রু নিপতিত হয়েছে বলে কৌরবশিবিরে একটা দারুণ আনন্দের কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু পাণ্ডবপক্ষেও এ কী, এ কী, এটা কী হচ্ছে! আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ঘটোৎকচের মৃত্যু উপলক্ষে কৃষ্ণও এত আনন্দিত হয়েছেন যে, তিনি নাচতে শুরু করে দিয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিস্মিত হয়ে বললেন, “সে কী! ওই রাক্ষসটা তো শুধু ভীমের ছেলেই নয়, সে পাণ্ডবপক্ষকে এতখানি সাহায্য করছিল, তার মৃত্যুতে কৃষ্ণ আনন্দিতই বা হবেন কেন, নাচতে শুরু করবেনই বা কেন?”

সঞ্জয় বললেন, “কৌরবপক্ষের অনেকেই তা বুঝতে পারছেন না। কৃষ্ণর ব্যবহার দেখে তাঁরা অনেকেই বিস্মিত আর বিরক্ত। কিন্তু আমি কারণটা অনেকটা বুঝতে পেরেছি।”

কর্ণ অর্জুনকে পরাজিত করার জন্য তাঁর একটা বিশেষ অস্ত্র আলাদা করে রেখেছিলেন। তার নাম একাঘ্নী বাণ। সেই বাণ কারও দিকে ধাবিত হলে, তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এর থেকে বাঁচার

কোনও পথ নেই। আর ঘটোৎকচকে মারতে গিয়ে কর্ণ বাধ্য হয়ে তাঁর সেই অস্ত্র খরচ করে ফেললেন। তাতে অর্জুনের বিপদ অনেক কমে গেল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের মহাভারত' এই পর্যন্ত লিখেছিলেন। পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে আমরা মহাভারত-এর বাকি অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করলাম।

ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর দ্রোণ আবার পাণ্ডব সৈন্যদের মারতে লাগলেন। তাঁর সামনে পাণ্ডবরা কেউ দাঁড়াতে পারলেন না। তখন কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন, দ্রোণকে ঠেকানোর একটাই উপায়, কেউ তাঁর সামনে গিয়ে বলুক, "অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে।"

অর্জুন তো গুরুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি রাজি হলেন না এ কাজ করতে। বাকিরা অবশ্য আপত্তি করলেন না। এমনকী, যুধিষ্ঠিরও সায় দিলেন কৃষ্ণর প্রস্তাবে। পাণ্ডবপক্ষের ইন্দ্রবর্মার একটা হাতি ছিল, যার নাম অশ্বত্থামা। পরিকল্পনা মতো গদা দিয়ে সেই হাতিটা মেরে ভীম গিয়ে দ্রোণের সামনে বললেন, "অশ্বত্থামা মরে গিয়েছে।"

অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা হঠাৎ কানে আসায় দ্রোণ যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। তারপরই তাঁর মনে হল, আরে, অশ্বত্থামা তো অমর! ও

কীভাবে মরবে? তবু বাবার মন তো। এমন খবর শুনলে কি স্থির থাকা যায়? দ্রোণ জানতেন, যুধিষ্ঠির সব সময় সত্যি কথা বলেন। দ্রোণ তখন যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, "যুধিষ্ঠির, এটা কি সত্যি যে অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে?"

কিন্তু দ্রোণ ভাবতেও পারেননি, তাঁর শিষ্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, এভাবে তাঁর সঙ্গে চালাকি করবেন। যুধিষ্ঠির করেছিলেন কী, তিনি জোরে দ্রোণকে শুনিয়ে বললেন, "অশ্বত্থামা হত।"

তারপর নিচু গলায় বললেন, "ইতি গজ।"

কৃষ্ণর বুদ্ধি সফল হল। দ্রোণ যুদ্ধের হইচইয়ের মাঝখানে শুধু শুনলেন, "অশ্বত্থামা হত।"

কোনও বাবা কি পারেন, ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে ঠিক থাকতে? দ্রোণও পারলেন না। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন। সেই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বধ করলেন দ্রোণকে।

দ্রোণ মারা যেতে কর্ণ হলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি। কিন্তু কর্ণর কোনও ভাল সারথি ছিল না। তাই কর্ণ চাইলেন, শল্যকে নিজের রথের সারথি করতে। সেকথা শুনে শল্য ভারী রেগে গেলেন। তবু দুর্যোধন অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে রাজি করালেন। কর্ণ মহাদাপটে পাণ্ডবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এরই মধ্যে যুদ্ধের অন্য এক প্রান্তে লড়াই লাগে ভীম আর

দুঃশাসনের। ভীমের সঙ্গে দুঃশাসনের বহুদিনের শত্রুতা। পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যাওয়ার পর দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে দুঃশাসনই টানতে-টানতে তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। তখনই ভীম শপথ নিয়েছিলেন, একদিন দুঃশাসনকে মেরে তাঁর বুকের রক্ত পান করবেন। এবার ভীম সেই সুযোগ পেয়েছেন। গদার আঘাতে ঘায়েল করে তিনি চড়ে বসলেন দুঃশাসনের উপর। তারপর দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করতে থাকেন।

ওদিকে হয়েছে কী, অর্জুন আর কর্ণ তো এবার মুখোমুখি। দু'জনেই পরস্পরের দিকে প্রবল বিক্রমে তির ছুড়তে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে তখন কর্ণর রথের চাকা মাটিতে বসে যেতে থাকল। এর পিছনে রয়েছে আরও দুটো ঘটনা। কর্ণ অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন পরশুরামের কাছে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের পছন্দ করতেন না। অথচ কর্ণ তো আসলে ক্ষত্রিয়। কর্ণ করেছিলেন কী, নিজের পরিচয় চেপে গিয়ে পরশুরামকে বলেছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ।"

পরশুরাম সরল মনে কর্ণকে বিশ্বাস করে তাঁকে নানা অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন। তারপর একদিন তিনি জানতে পারলেন, কর্ণ ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয়। আর যান কোথায়! তৎক্ষণাৎ পরশুরাম অভিশাপ দিলেন, "মৃত্যুর সময় তুমি এই বিদ্যা ভুলে যাবে।"

এখানেই শেষ নয়। কর্ণ একবার ভুল করে এক ব্রাহ্মণের বাছুর

মেরে ফেলেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ বাছুরের দুঃখে কাতর হয়ে কর্ণকে শাপ দিয়েছিলেন, “যুদ্ধের সময় তোমার মনে যখন আতঙ্ক হবে, তখন তোমার রথের চাকা মাটিতে বসে যাবে।”

অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে কর্ণর মনে আতঙ্ক ছিলই। ফলে তাঁর রথের চাকা মাটিতে গেঁথে যায়। কর্ণ অনেক টানাটানি করেও সেই চাকা তুলতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে অর্জুনের উদ্দেশে বললেন, “অর্জুন, তুমি তো ভারী ধার্মিক। একটু দাঁড়াও, আমি আগে রথের চাকা তুলে নিই। তারপর আবার যুদ্ধ করব।”

অর্জুন কিছু বলার আগে কৃষ্ণ বললেন, “কর্ণ, নিজের রথের চাকা মাটিতে গেঁথে যাওয়ায় তোমার ধর্মের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমান করেছিলে, যুধিষ্ঠিরকে ছল করে পাশা খেলায় হারিয়েছিলে, জতুগৃহে পাণ্ডবদের পোড়াতে গিয়েছিলে, সবাই মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?”

কর্ণ কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। আর অর্জুন তির ছুড়ে তক্ষুনি কর্ণকে মেরে ফেললেন। এর পর একা দুর্যোধন ছাড়া কৌরবশিবিরে আর কোনও বড় বীর রইলেন না। তবু শল্যকে সেনাপতি করে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন দুর্যোধন। কিন্তু সেই যুদ্ধে তাঁর বাকি ভাইরা মারা পড়ল। মারা পড়লেন শল্যও। সহদেব বধ করলেন শকুনিকে।

কৌরবসৈন্যরা ততক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করেছেন। দুর্যোধন ছাড়া শুধু কৃপ, কৃতবর্মা বেঁচে রইলেন। বিপদ বুঝে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের জলের তলায় লুকোলেন। সেই খবর পেয়ে পাণ্ডবরাও হ্রদের ধারে এসে দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্য ডাকতে লাগলেন।

সেই ডাকে থাকতে না পেরে দুর্যোধন বেরিয়ে এলেন। ঠিক হল, ভীম এবং দুর্যোধন গদাযুদ্ধ করবেন। ততক্ষণে দু'জনের গুরু বলরামও সেখানে হাজির। সবাই মিলে গেলেন কুরুক্ষেত্রে। শুরু হল দু'জনের গদাযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, দুর্যোধনকে হারানো মুশকিল। তাই কৃষ্ণ ইশারায় ভীমকে বললেন, দুর্যোধনের ঊরুতে আঘাত করতে। আসলে গদাযুদ্ধের নিয়ম হল, নাভির নীচে আঘাত করা যাবে না। কিন্তু ভীমও লড়াই করতে-করতে টের পাচ্ছিলেন দুর্যোধনকে সরাসরি হারানো সম্ভব নয়। সেই জন্য দুর্যোধন একবার লাফিয়ে উঠতেই ভীম গদার বাড়ি মারলেন তাঁর ঊরুতে। সেই আঘাতেই পড়ে গেলেন দুর্যোধন। কিন্তু ভীমের এই আচরণে অনেকেই ছি ছি করে উঠলেন। বলরাম তো ভীষণ রেগে গেলেন। অনেক কষ্টে কৃষ্ণ শান্ত করলেন তাঁকে।

দুর্যোধনকে ওখানে ফেলে পাণ্ডবরা গেলেন শিবিরে। তবে কৃষ্ণর কথা শুনে তাঁরা শিবিরে না থেকে চলে যান নদীর ধারে।

সেই রাতে দুর্যোধনের কাছে আসেন অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্মা।

মর-মর অবস্থায় দুর্যোধন তখন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করলেন। সেই রাতে পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে অশ্বত্থামা হত্যা করলেন সব ঘুমন্ত বীরদের। শিবিরের বাইরে তখন পাহারা দিয়েছেন কৃপ এবং কৃতবর্মা। সেই খবর দুর্যোধনকে দেওয়ার পর তিনি মহানন্দে মারা গেলেন।

পরদিন পাণ্ডবরা নদীর ধার থেকে ফিরে সব জানতে পারলেন। ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণ এবার অশ্বত্থামার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর যাওয়ার পর অশ্বত্থামার দেখা মিলল। পাণ্ডবদের এবং কৃষ্ণকে দেখেই অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুড়লেন। অর্জুনও ছুড়লেন দ্রোণদত্ত অস্ত্র। তখন নারদ এবং ব্যাসদেব এসে এই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জনকে অস্ত্র সংবরণ করতে বললেন। না হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু একবার অস্ত্র ছুড়লে তার ফলে তো কিছু ক্ষতি হবেই। তাই অর্জুনের অস্ত্রের ফলে অশ্বত্থামার মাথার মণি পাণ্ডবরা পেলেন। আর ওদিকে অভিমন্যুর শিশুপুত্র মারা গেল। তবে কৃষ্ণ এসে আবার শিশুটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুধিষ্ঠির রাজা হলেন। তারপর তিনি গেলেন ভীষ্মের কাছে। কীভাবে রাজ্য চালাতে হয় মারা যাওয়ার আগে তা নিয়ে ভীষ্ম প্রচুর উপদেশ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। রাজা হওয়ার পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন।

কিন্তু ওদিকে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী হস্তিনাপুরে থেকে স্বস্তি

পাচ্ছিলেন না। তাঁদের সব ছেলে মারা গিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁদের বয়সও বেড়েছে। সেই জন্য ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয় বনে গিয়ে তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা বনে যাওয়ার তিন বছর বাদে, সেই বনে আগুন লাগে। তাতে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী পুড়ে মারা যান।

অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর এমন কিছু ঘটনা হতে থাকল, যাতে বোঝা গেল বিপদ আসছে। সেই বিপদ এল অন্যভাবে। একদিন কৃষ্ণর বংশের সবাই গেলেন প্রভাস তীর্থে। সেখানে নিজেদের মধ্যে সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধে। তখন মারামারির ফলে কৃষ্ণ-বলরাম ছাড়া সবাই মারা পড়লেন। একজনকে দিয়ে হস্তিনাপুরে খবর পাঠিয়ে, রাজ্যের মেয়েদের বাবা বসুদেবের কাছে রেখে কৃষ্ণ যখন বলরামের সামনে এলেন, তখন দেখলেন বলরামের মুখ দিয়ে এক ভয়ংকর সাপ বেরিয়ে আসছে। কৃষ্ণ বুঝলেন, বলরাম দেহত্যাগ করলেন। তিনি তখন জঙ্গলের এক জায়গায় শুয়ে থাকলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে এক ব্যাধের মনে হল, ওটা বোধ হয় কোনও হরিণ। তাই সে তির ছুড়ে মারল। সেই তিরে মৃত্যু হল কৃষ্ণর।

অর্জুন যখন দ্বারকায় এসে পৌঁছলেন তখন সব শেষ। তিনি করলেন কী, দ্বারকার মেয়েদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু

মাঝপথে ডাকাতরা হামলা করে। অবাক কাণ্ড, অত বড় বীর অর্জুন, তিনিও গাণ্ডিব তুলে ডাকাতদের মারতে পারলেন না। ডাকাতরা সব লুটপাট করে চলে গেল।

অর্জুনের কাছে সব শুনে যুধিষ্ঠির বুঝলেন, তাঁদের এবার মহাপ্রস্থানের পথে রওনা দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। তখন পরীক্ষিৎকে রাজা ঘোষণা করে পাণ্ডবভাইরা এবং দ্রৌপদী যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের সঙ্গে চলল একটা কুকুরও। সেই মহাপ্রস্থানের পথে একে-একে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম পড়ে গেলেন। ভীমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলতে থাকেন, কোন পাপে কার পতন হয়েছে। অবশেষে স্বশরীরে স্বর্গে পৌঁছলেন যুধিষ্ঠির। দেবতারা যখন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিতে চাইলেন, যুধিষ্ঠির তখন কুকুরটিকে সঙ্গে নেওয়ার কথা জানালেন। সেই মুহূর্তে কুকুরটি নিজের রূপ বদলাল। দেখা গেল, কুকুরটি সাক্ষাৎ ধর্ম। যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করার জন্যই কুকুর সেজেছিলেন।

স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন, সেখানে তাঁর ভাইয়েরা এবং দ্রৌপদী নেই। কিন্তু দুর্যোধন মহানন্দে স্বর্গে রয়েছেন। যুধিষ্ঠির খুব অবাক হলেন। দেবতাদের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, অন্য পাণ্ডবভাইরা আর দ্রৌপদী কেন স্বর্গে নেই? আর এত কুকর্ম করার পর দুর্যোধনই বা কীভাবে স্বর্গে আসতে পারেন!

নারদ তখন যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন, দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে মারা

গিয়েছেন। আর বিপদে পড়লেও তিনি কখনও ভয় পাননি। সেই জন্য মৃত্যুর পর দুর্যোধন স্বর্গে এসেছেন।

সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, "আমারা ভাইয়েরা এবং দ্রৌপদীকে ছাড়া আমি স্বর্গে কীভাবে থাকব? ওদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ওরা যেখানে আছে, সেটাই আমার স্বর্গ।"

যুধিষ্ঠিরের দুঃখ দেখে দেবতারা তখন একজন দেবদূতকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, তাঁকে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য।

দেবদূত এর পর যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন সেই পথে। কিছু দূর গিয়েই যুধিষ্ঠির টের পেলেন পথ বড় ভয়ংকর। পাপীরাই শুধু ওই অন্ধকার, পচা-গলা মৃতদেহ পড়ে থাকা পথ দিয়ে যাতায়াত করে। আবার আগুনের আঁচও এসে লাগছে। মাথার উপর উড়ছে শকুনেরা। যুধিষ্ঠির আর থাকতে না পেরে দেবদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কতটা যেতে হবে?"

দেবদূত বললেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হলে দেবতারা আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনি কি ফিরবেন?"

যুধিষ্ঠির তখন ঠিক করলেন ফিরে যাবেন। যেই তিনি ফিরতে গেলেন, অমনি চারদিক থেকে করুণ স্বরে কারা বলতে লাগল, "যাবেন না মহারাজ! আর একটু থাকুন। আপনি আসায়

অনেকদিন বাদে চারপাশ ঠান্ডা হয়েছে।”

যুধিষ্ঠিরের বড় মায়া হল। তাই তিনি জানতে চাইলেন, “তোমরা কারা?”

এবার যুধিষ্ঠিরের আশপাশ থেকে শব্দ আসতে থাকল।

কেউ বলল, “আমি ভীম।”

কেউ বলল, “আমি অর্জুন।”

কেউ বলল, “আমি দ্রৌপদী।”

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ দেবদূতকে বললেন, “আপনি স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের বলুন, আমি এখানেই থাকব। ভাইদের পেয়ে আমি সুখী হয়েছি।”

দেবদূতের কাছে এ কথা জানার পর সব দেবতারা সেই ভয়ংকর জায়গায় এলেন। ইন্দ্র এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, “মহারাজ, আপনার আর আপনার ভাইয়েরা যে পাপ করেছেন, তার জন্যই সকলকে একবার নরকে আসতে হল। এবার আপনারা স্বর্গে চলুন।”

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষ আবার কোন পাপে নরকে এলেন! আসলে এই নরকদর্শন যুধিষ্ঠিরের দরকার ছিল। কারণ, দ্রোণকে “ইতি গজ,” কথাটা ফিসফিসিয়ে বলে তিনি পাপ করেছিলেন। একবার নরকদর্শনে সেই পাপ কেটে গেল।

ধর্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে গেলেন মন্দাকিনী নদীতে। ওই নদীর জলে স্নান করলে মানুষের শোক, দুঃখ, হিংসে, রাগ কিছুই থাকে না।

যুধিষ্ঠির মন্দাকিনী নদীতে স্নান করার পর মানব শরীর ত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির বাকি ভাইদের, দ্রৌপদী এবং অন্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দিন কাটাতে লাগলেন।